ত্রিপুরায় কমিউনিস্ট পার্টি
ও
গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রাথমিক স্তর

অঘোর দেববর্মা

পরিবেশক
ইন্দো-সোভিয়েত সংস্কৃতি সংস্থা
প্যালেস কম্পাউণ্ড আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা

প্রকাশক
শ্রীদিলীপ কুমার সাহা
দেবেন্দ্র ভবন
উত্তর বনমালিপুর
আগরতলা,
পশ্চিম ত্রিপুরা,

প্রথম প্রকাশ
১৯৮৬

প্রচ্ছদ
পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

মুদ্রাকর
শ্রীমৃণালকান্তি রায়
রাজলক্ষ্মী প্রেস
৩৮ সি, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

দাম ঃ দশ টাকা

মুখবন্ধ

কমরেড বীরেন দত্তের লিখিত "আমার স্মৃতিতে কমিউনিস্ট পার্টি ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পটভূমিকা" সম্পর্কে উল্লিখিত প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলির পর্যালোচনা এবং ঘটনাপ্রবাহের বাস্তবতাগুলি আমার লিখিত পুস্তিকায় সঠিকভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। ত্রিপুরার তৎকালীন অস্থির রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে যে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির তৎপরতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল আমার পুস্তিকায় সংক্ষিপ্তভাবে তা'রও আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে ধারাবাহিক কোন ইতিহাস লেখার চেষ্টা করা হয়নি। অবশ্য পরবর্তী সময়ে কেহ ইতিহাস লিখতে আগ্রহী হলে আমার পুস্তিকা থেকে অনেক তথ্য ও ঘটনা সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। কমরেড বীরেন দত্তের লিখিত প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি পর্যালোচনা করতে গিয়ে অনেক সময় অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটি ঘটনা বারবার উল্লেখ করতে হয়েছে। আমার পুস্তিকায় জনশিক্ষা সমিতির সংগঠন সম্পর্কে বিস্তৃত না হলেও মূল উদ্যোক্তা কারা ইহা আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। তদুপরি প্রজামণ্ডল, পার্বত্য উপজাতি সেবা সমিতি, ত্রিপুর সংঘ, আঞ্জুমান ইস্‌লামিঞা, মুসলিম প্রজা মজলিশ, ফরওয়ার্ড ব্লক ও বর্ম তৎপরতা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ রাজ্যে কমিউনিস্ট পার্টি উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রাথমিক স্তরে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত বা সংগঠিত হয়েছিল—ইহার পর্যালোচনা করতে গিয়ে স্বাভাবিক কারণেই আমার ব্যক্তিগত ভূমিকার কথা আলোচনা করতে হয়েছে। কারণ কমরেড বীরেন দত্ত তার লিখিত পুস্তিকাতে ত্রিপুরার কমিউনিস্ট পার্টি উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রাথমিক স্তরে আমার ব্যক্তিগত ভূমিকাকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টা নিয়েছেন। এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ বাস্তব ঘটনাগুলিকে অসংলগ্ন-ভাবে উল্লেখ করে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

কমরেড বীরেন দত্ত তার লিখিত পুস্তিকাতে আমাকে জনতার মধ্যে হেয় প্রতিপন্ন করার হীন উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন কায়দায় মিথ্যা অভিযোগ এনেই তিনি ক্ষান্ত হন নি, আমাকে C. I. A.-এর এজেন্ট বলে মন্তব্য করতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নি।

এই সমস্ত প্রাসঙ্গিক কারনেই ত্রিপুরায় কমিউনিস্ট পার্টি উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ও সংগঠিত হওয়ার প্রাথমিক স্তরে আমার ব্যক্তিগত ভূমিকার কথা আলোচনা করতে বাধ্য হয়েছি। প্রসঙ্গতই সেখানে ব্যক্তিগত ভূমিকা —কাজেই আমার ব্যক্তিগত ভূমিকাকে বাদ দিয়ে আলোচনা সম্ভব হয়নি। ইহা যদি কেহ আমার লিখিত পুস্তিকা পড়ে আমার ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার প্রবণতার ঝোঁক ইত্যাদি বলে মন্তব্য করেন অথবা সমালোচনা করেন—তাতে আমার বলার কিছুই নেই।

তদুপরি কমরেড বীরেন দত্তের লিখিত পুস্তিকার পর্যালোচনা প্রসঙ্গে আমি কোন ব্যক্তিবিশেষকে সজ্ঞানে অসংযতভাবে সমালোচনা করি নাই। ঐতিহাসিক বাস্তব ঘটনাগুলিকে সঠিকভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। তাতেও যদি কেহ আমার সঠিক তথ্য উল্লেখ করার কারণে আঘাতপ্রাপ্ত হন তাতে আমি দুঃখিতই হব। ঐতিহাসিক সঠিক তথ্যগুলি উপস্থিত করাই আমার মূল লক্ষ্য। কাকেও সমালোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে।

ত্রিপুরা
২৮।১।৮৬

শ্রীঅঘোর দেববর্মা

উৎসর্গ

ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মূল উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রয়াত বংশী ঠাকুর, প্রয়াত প্রভাত রায় এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রাথমিক স্তরে মিলিটারীর বর্বরোচিত আক্রমণে নিহত শহীদ রাজেন্দ্র দেববর্মা (সর্দার,) [illegible] এলাকার নারায়ণ খামারবাড়ী, গোলাঘাটির শহীদ চন্দ্রকুমার দেববর্মা, সতীশ দেববর্মা, দেবেন্দ্র দেববর্মা, কড়া দেববর্মা, ভাবুয়া দেববর্মা, গাছি [illegible] প্রমুখ এবং খোয়াই বিভাগের চাম্পা হাওর এর শহীদ [illegible], [illegible] প্রমুখ শহীদদের স্মরণে আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা।

প্রথম পর্ব

কমরেড বীরেন দত্তের লিখিত "আমার স্মৃতিতে কমিউনিস্ট পার্টি ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পটভূমিকা"—সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য।

ত্রিপুরার বর্ষীয়ান কমিউনিস্ট নেতা কমরেড বীরেন দত্তের লিখিত "আমার স্মৃতিতে কমিউনিস্ট পার্টি ও গনতান্ত্রিক আন্দোলনের পটভূমিকা" বইটি পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কমঃ দত্ত ত্রিপুরার কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম নেতা। তিনি জীবনে বহুবার কারাবরণ করেছেন এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আন্দোলনে অংশগ্রহণও করেছেন ইহা অনস্বীকার্য। তিনি ত্রিপুরার জাতি-উপজাতি সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পেয়েছেন।

কাজেই কমরেড দত্তের লিখিত পুস্তিকাটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব খুবই বেশী এবং এই বইটি পড়ার জন্য সাধারণ মানুষের আগ্রহ সৃষ্টি হবে এটাই স্বাভাবিক, ত্রিপুরার কমিউনিস্ট পার্টির আন্দোলনের প্রাথমিক ঐতিহাসিক তথ্যগুলি সঙ্গত কারণেই কমরেড দত্তের কাছ থেকে জানবার আগ্রহ থাকবে। কমরেড দত্তের এই প্রচেষ্টা প্রসংসনীয় উদ্যোগ ইহা একবাক্যে সকলেই স্বীকার করবেন। কিন্তু একটি ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহকে সঠিক তথ্য ও বাস্তবতার সহিত সঙ্গতিসম্পন্ন করে তুলে ধরতে হলে যে কোন লেখকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি (অর্থাৎ কোনরকম সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত না হয়ে) এবং সৎসাহস থাকা একান্ত প্রয়োজন।

কমরেড বীরেন দত্তের লিখিত পুস্তিকাটিতে উল্লেখিত দুইটি বিষয়ের যথেষ্ট অভাব আছে। বইটিতে কমরেড দত্ত তার অসংলগ্ন ঐতিহাসিক বিকৃত তথ্য ও অশালীন উক্তিগুলির সমর্থন কুড়োবার জন্য কিছু প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাদের বিভিন্ন সময়ের লেখাকে কোটেশান তুলে তোয়াজ করার প্রবনতার ঝোঁকই পরিলক্ষিত হয়। পুস্তিকাটি মনোযোগের সহিত পড়লে এই কথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে, ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহের পটভূমিকা ও বাস্তবতার বিচার বিশ্লেষণ করার ধৈর্য, সহনশীলতা ও আত্মবিশ্বাস কমরেড বীরেন দত্তের ছিল

না, ফলে পুস্তিকাটিতে ঘটনার ধারাবাহিকতার সঙ্গতি নেই বললেই চলে। অনেকটা আবোল তাবোল ও বিভ্রান্তিকর বলেই মনে করার কারণ আছে।

তদুপরি আমার সম্পর্কে বাস্তব ঘটনাগুলির বিচার বিশ্লেষণ না করে যেভাবে হালকা ধরনের মন্তব্য ও অশালীন উক্তি ইত্যাদি করেছেন ইহা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। একজন রাজনৈতিক নেতার মন যে এত সংকীর্ণ পংকিলতায় আচ্ছন্ন তা ভাবতেও কষ্ট হয়। অবশ্য আমি যদি সি পি. আই না হয়ে সি. পি. এম্ হতাম তা হলে কমঃ দত্ত নিশ্চিতভাবেই আমার বিরুদ্ধে আশালীন উক্তি ইত্যাদি করতেন না। তবে অঘোর দেববর্মা সি. পি. আই-এর রাজ্যশাখার নেতৃস্থানীয় কর্মী- অতএব তাকে রাজনৈতিক কারণে হেয় প্রতিপন্ন করার মূল লক্ষ্য নিয়েই যদি কমঃ দত্ত এই পুস্তিকাটি লিখে থাকেন তা হলে বলার কিছু নেই। কারণ সি. পি. এম নেতৃত্ব বরাবর সি. পি. আইকে জ্ঞাতি শত্রু মনে করে থাকেন।

তথাপি কমরেড দত্তের পুস্তিকায় পরিবেশিত তথ্য ও ঘটনাগুলি সবই অসত্য, বিভ্রান্তিকর, অসংলগ্ন, তিলকে তাল করা ও কাল্পনিক এই কথা বলব না। ত্রিপুরার প্রাথমিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকে তুলে ধরার প্রচেষ্টাকে অভিনন্দনই জানাব। তবে কমরেড দত্ত যদি সংকীর্ণতামুক্ত মন নিয়ে বাস্তব অবস্থার বিচার বিশ্লেষণ করতেন, বিকৃত তথ্য, তিলকে তাল করার চেষ্টা না করতেন, ও বিভ্রান্তিকর উক্তিগুলি না করতেন তাহলে খুবই খুশী হতাম। ত্রিপুরার উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রাথমিক স্তরে আমার ব্যক্তিগত ভূমিকার কথা কমঃ দত্ত কেন, আমার যদি মহাশত্রুও থেকে থাকে তার পক্ষেও অস্বীকার করা সম্ভব নহে। ভুলত্রুটি অবশ্যই অনস্বীকার্য। আমি কমঃ দত্তের পরিবেশিত ভুল তথ্য, অতিরঞ্জিত বিভ্রান্তিকর ও অশালীন উক্তিগুলির যতটুকু সম্ভব সংযতভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করব। তিনি আমার রাজনৈতিক গুরু বটে কিন্তু ঐতিহাসিক ভুল তথ্য ও বিভ্রান্তকর উক্তিগুলি আমার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নহে।

কমরেড বীরেন দত্তের পুস্তিকাকে ২০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে আমার বলার কিছু নেই। তবে মহেন্দ্র দেববর্মার সম্পাদনায় প্রকাশিত ইয়্যাপ্রি পত্রিকায় কমঃ "হেমন্ত স্মরণে" সংখ্যাতে কমঃ দশরথ দেব-এর লিখিত প্রবন্ধ থেকে কমঃ দত্ত আচমকা অসংলগ্নভাবে কোটেশন তুলে দিয়েছেন। এই কোটেশনের বিষয় সম্পর্কে কমঃ দত্তের কিন্তু কোন মন্তব্য নেই। প্রসঙ্গ হচ্ছে "১৯৩১ সনে রাণী গইডুলুর নেতৃত্বে নাগা পার্বত্য উপজাতিদের মধ্যে বৃটিশ বিরোধী সশস্ত্র সংঘর্ষ, মণিপুরে বৃটিশ বিরোধী সংগ্রাম" ইত্যাদি ঐ সময় এই সমস্ত পরিবেশের মধ্যে পাঁচ লক্ষাধিক উপজাতি অধ্যুষিত ত্রিপুরায় জনমঙ্গল সমিতির আন্দোলন এক বিশেষ প্রেরণা সৃষ্টি করেছিল। (১৯ পৃষ্ঠায় পরিবেশিত) কমঃ বীরেন দত্ত জনমঙ্গল সমিতির একজন সক্রিয় কর্মী। ১৯৩১ সনে জনমঙ্গল সমিতির নেতৃত্বে ত্রিপুরায় রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য কি কি ঐতিহাসিক

আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল এবং সাব্রুম থেকে ধর্মনগর পর্যন্ত আন্দোলনের প্রসারতা, আন্দোলনের মূল দাবীগুলি ও কে বা কাহারা আন্দোলনের নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন কোনরকম তথ্য ও ঘটনা কমঃ বীরেন দত্ত উল্লেখ করতে পারেন নি। তিনি শুধু কমঃ দশরথ দেবের লিখিত বক্তব্যের কোটেশন দিয়েই দায়িত্ব খালাস করেছেন। কমঃ দত্তের আলোচ্য প্রসঙ্গ ১৯৩১ সন। অথচ কমঃ দশরথ দেবের আলোচ্য প্রসঙ্গ হচ্ছে ১৯৩৯ সনের গোড়ার দিকে যাদের জনমঙ্গল সমিতির পুরোভাগে দেখেছেন তাদের নাম তিনি উল্লেখ করেছেন। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে আলোচ্য পুস্তিকাটির ১৯ পৃষ্ঠায় কমঃ দত্ত ১৯৩১ সনে নাগা উপজাতিদের মধ্যে রাণী গইডুলুর নেতৃত্বে ও মণিপুরে বৃটিশ-বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে ঐ একই সময়ে জনমঙ্গল সমিতির নেতৃত্বে ত্রিপুরাতেও রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কথা উল্লেখ করেছেন। অথচ কমঃ দত্ত কোন তথ্যাদি উপস্থিত করতে পারেন নি, তাই কমঃ দশরথের ১৯৩৯ সনের জনমঙ্গল সম্পর্কিত বক্তব্যকে কমঃ বীরেন দত্ত ১৯৩১ সনের জনমঙ্গল সমিতির আন্দোলনের সমর্থনে আচমকা কোটেশন দিয়ে দাঁড় করিয়েছেন। এখানে সহৃদয় পাঠকবর্গ নিশ্চয়ই বিবেচনা করবেন—১৯৩১ সনের জনমঙ্গল সমিতির আন্দোলনের প্রসঙ্গের সহিত ১৯৩৯ সনের কমঃ দশরথ দেবের জনমঙ্গল সম্পর্কিত আন্দোলনের প্রসঙ্গের কোন সঙ্গতি আছে কিনা ? কমঃ দত্তের জানা প্রয়োজন যে কোন ধরনের আন্দোলন কিংবা সংগ্রাম করতে হলে জনসাধারণকে বাদ দিয়ে হয় না। গোপন সংগঠন করতে হলেও জনসমর্থনের প্রয়োজনীয়তা আছে। তাছাড়া তিনি যে সময়ের কথা উল্লেখ করেছেন তখন ত্রিপুরায় রাজ-তন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে উপজাতি জনগোষ্ঠীর কোন সর্দারের মানষিকতা থাকার কথা ছিল না, তৎসময়ে ত্রিপুরার সামন্ত রাজাদের সৃষ্ট ত্রিপুর ক্ষত্রিয় মণ্ডল খুবই শক্তিশালী সংগঠন ছিল। সামন্ততান্ত্রিক আমলে এ রাজ্যে উপজাতি জনগোষ্ঠীর পরই মুসলমান সম্প্রদায়ের স্থান। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও সর্দারী প্রথা অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। কোন মুসলমান সর্দারের পক্ষে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করাও তৎসময়ে রীতিমত অবিশ্বাস্য। বাঙ্গালী হিন্দুদের সংখ্যাও তখন ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলে খুবই নগণ্য ছিল, শহরগুলিতে বাঙ্গালীদের মধ্যে অধিকাংশই কর্মচারী নতুবা ব্যবসায়ী অথবা রাজন্যবর্গের অনুগ্রহে সুবিধাভোগী শ্রেণী। ত্রিপুরার উল্লেখযোগ্য বাজারগুলিতে ব্যবসায়ী বাঙ্গালীদের মধ্যে অধিকাংশই জিরাতিয়া প্রজা। অতএব ১৯৩১ সনে বাঙ্গালী হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার মত মানসিকতা ছিল বলে মনে করার কারন ছিল না। তবে সচেতন বাঙ্গালীর মুষ্টিমেয় কয়েকজন তখন রাজনৈতিক কাজকর্মে লিপ্ত ছিলেন, তাদের আন্দোলনের প্রধান ক্ষেত্র পূর্ব বাংলা অধুনা বাংলাদেশ ছিল। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে বিভিন্ন সংগঠন

সংশ্লিষ্ট ছিল। তৎসময়ে সারা গ্রেপ্তার বরণ করেছিলেন প্রত্যেকের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল বৃটিশ বিরোধী। আন্দোলন, জনমঙ্গল সমিতির অন্যতম সক্রিয় কর্মী প্রয়াত প্রভাত রায়ের প্রাথমিক রাজনৈতিক ক্ষেত্র ছিল কুমিল্লা। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের তিনিও সক্রিয় কর্মী ছিলেন। কমরেড বীরেন দত্তের রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রও পূর্ববাংলা ছিল। পরবর্তী সময়ে কমঃ দত্ত, প্রয়াত প্রভাত রায় ও বংশী ঠাকুর প্রমুখ ব্যাক্তিদের নেতৃত্বে এ রাজ্যে জনমঙ্গল সমিতি গড়ে ওঠে। আগরতলা শহরের কিছু প্রগতিশীল যুবক অপ্রকাশ্যে জনমঙ্গল সমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। গ্রামাঞ্চলেও হয়ত কিছু ব্যাক্তিবিশেষের জনমঙ্গল সমিতির নেতৃত্বের সহিত যোগাযোগ ছিল। ১৯৩১ সনে নাগা ও মনিপুরে যেভাবে বৃটিশ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রাম সংগঠিত হয়েছিল, ত্রিপুরাতে তৎসময়ে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার মত কোন গণভিত্তিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল বলে কোন প্রামান্য নজীর কমরেড দত্ত উপস্থিত করতে পারেন নি। পরবর্তীকালে ১৯৪৮ সনে আত্মগোপন করার সময়ও ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলে তিনি কোথাও জনমঙ্গল সমিতির পুরানো কমী কিংবা ভিত্তি আছে বলে প্রমান করতে পারেন নি, কাজেই ১৯৩১ সনে ত্রিপুরার রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কোন বাস্তব ভিত্তি আছে বলে আমি মনে করি না।

তদুপরি কমরেড দশরথ ১৯৩৯ সনের গোড়ার দিকে আগরতলা ও তার আশে পাশে জনমঙ্গল সমিতির জনসভাগুলি দেখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি প্রসঙ্গত আগরতলা শহরের পূর্বদিকে দুর্গা চৌধুরী পাড়ার প্রয়াত হেমন্ত দেববর্মার জেঠা চামুকবড়া ও জিরানিয়া বাজারের পশ্চিমদিকে ভাস্কর-কবড়া পাড়ার প্রয়াত শুক্রাম দেববর্মা (সর্দার)-এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। কমঃ দশরথ হয়ত ভুল বশতঃ সুকুমার দেববর্মা নাম দিয়েছেন। অথবা ছাপাতেও ভুল হতে পারে। জনশিক্ষা ও প্রজামণ্ডল আন্দোলন সংগঠিত করার সময় দুর্গা চৌধুরীর চামুকবড়া প্রয়াত প্রভাত রায় ও বংশী ঠাকুরের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল বলে জানা যায়, কিন্তু সদর পূর্ব ভাস্কর-কবড়া পাড়ার শুক্রাম সর্দারের অনুরূপ জনমঙ্গল সমিতির নেতৃত্বের সহিত যোগাযোগ ছিল কিনা জানা যায়নি। প্রয়াত সর্দার তৎকালীন ত্রিপুরার তীক্ষ্ম বুদ্ধি সম্পন্ন প্রয়াত বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের সৃষ্ট ত্রিপুরা ক্ষত্রিয় মণ্ডলের এলাকার একজন প্রভাবশালী সর্দার ছিলেন। ঐ সময়ে তার পক্ষে জনমঙ্গল সমিতিতে যোগাযোগ করা কিংবা সক্রিয় কর্মীর ভূমিকা গ্রহণ করা বাস্তব অবস্থার বিচার বিবেচনায় রীতিমত অসম্ভব ছিল। কোন প্রামান্য তথ্য ও ঘটনাও নেই। ১৯৪৫ সনে দুর্গা চৌধুরী পাড়াতে 'জন শিক্ষা' সমিতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রয়াত শুক্রাম সর্দারের সহিত আমিই প্রথম যোগাযোগ করেছিলাম। ত্রিপুর ক্ষত্রিয় মণ্ডলের সর্দারদের মধ্যে তিনি একজন প্রগতিশীল চিন্তাবিদ এবং জনশিক্ষা আন্দোলনের অত্যন্ত উৎসাহী কর্মী ছিলেন। প্রজামণ্ডলেও তিনি জনশিক্ষা সমিতির কর্মি হিসেবে

পরবর্তী সময়ে যোগদান করেছিলেন। গণমুক্তি পরিষদের প্রতিরোধ সংগ্রামের সময়েও সদর পূর্ব এলাকার অঞ্চল কমিটির কোষাধ্যক্ষ ছিলেন।

১৯৩৯ সনে কমরেড দশরথ দেব সম্ভবত আগরতলা উমাকান্ত বোর্ডিং-এ থেকে পড়াশুনা করতেন। তিনি Class-VII থেকে Class-VIII এ প্রমোশন পাওয়ার বৎসরে সম্ভবত ১৯৪০ সনে হঠাৎ একদিন ছাত্ররা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বোর্ডিং ছেড়ে বাড়িতে চলে যায়। ছাত্রদের মূল দাবী ছিল তৎকালীন বোর্ডিং সুপারিনটেনডেন্ট আনন্দদাসকে ছাড়ান। তৎকালীন মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর বোর্ডিং ছাত্রদের এই পদক্ষেপের খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ বোর্ডিং বাতিল করে দেন। এই বোর্ডিং এর নাম ছিল "রামকুমার ঠাকুর বোর্ডিং"। প্রয়াত শিক্ষানুরাগী রামকুমার ঠাকুর অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং প্রয়াত মহারাজা বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুরের একজন ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি। তিনিও খবর পাওয়ামাত্র আগরতলায় এসে বোর্ডিং পুনরায় চালু করার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু কৃতকার্য হননি। অগত্যা ঘোয়াই বিভাগের দুইজন ছাত্র কমরেড দশরথ ও অপর একজন দ্বারিক দেববর্মাকে সঙ্গে করে নিয়ে ঘোয়াই বোর্ডিং এ ভর্তি করিয়ে দেন। তখন সদরের ছাত্রদের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত ছিল, পাশেই আর একটি ওয়াখীরায় ঠাকুর বোর্ডিং নামে পরিচিত ছিল। রামকুমার ঠাকুর বোর্ডিং-এর ছাত্রদের মাসিক খোরাকী বাবদ মাসে (পাঁচ) টাকা ব্যয় বরাদ্দ ছিল। আমি ওয়াখীরায় ঠাকুর বোর্ডিং-এর ছাত্র ছিলাম। ওয়াখীরায় ঠাকুর বোর্ডিং এর ছাত্রদের মাসে মাত্র ৪ (চার) টাকা ব্যয় বরাদ্দ ছিল। প্রয়াত ওয়াখীরায় ঠাকুরও প্রভাবশালী এবং রাজার ঘনিষ্ঠ মহলের বিশ্বস্ত ব্যক্তি। তিনিও তখন বোর্ডিং পুনরায় চালু করার জন্য আদা নুন খেয়ে রাজার দরবারে গিয়েছিলেন। সহায়ক ছিলেন আগরতলার প্রয়াত নবীন ঠাকুর মহাশয়। শেষ পর্যন্ত পুনরায় বোর্ডিং চালু করালেন। দুইটি বোর্ডিং একত্রিত করা হয়েছিল। প্রয়াত নবীন ঠাকুরকে বোর্ডিং এর গার্জিয়ান করা হয়েছিল। ছাত্রদের মাসিক ভাতাও সমান করে ৫ (পাঁচ) টাকা করা হয়েছিল। তখন আমাদের বোর্ডিং সুপারিনটেন্ডেন্ট ছিলেন প্রয়াত বংশী ঠাকুর। ঐ সমস্ত ঘটনার সময় তিনি জনমঙ্গল সমিতির আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট বলে কারান্তরালে। কাজেই প্রয়াত আনন্দ দাসই বোর্ডিং সুপারিটেন্ডেন্ট থেকে যান। কমঃ দশরথ খোয়াই বোর্ডিং-এ স্থানান্তরিত হওয়ার পর জনশিক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত আগরতলার সহিত কোনরকম যোগাযোগ ছিল বলে মনে হয় না। কমঃ দশরথ যে সময়ের কথা এখানে উল্লেখ করেছেন তখন বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুরের প্রচণ্ড প্রতাপ। রাজ্যের প্রতিটি দৈনন্দিন খবর রাজার কানে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য বহুবিধ ব্যবস্থা ছিল। তৎসময়ে আগরতলা ও তার আশেপাশে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে জনমঙ্গল সমিতি সভা সমিতি করেছে বলে কমঃ দশরথ যে উক্তি করেছেন ইহারও বাস্তবতার সহিত কোন সঙ্গতি নেই। প্রয়াত বংশীঠাকুর আমাদের বোর্ডিং

সুপার ছিলেন। প্রায় সময়েই মোগরায় তার শ্বশুরবাড়ীতে অবস্থান করতেন। আগরতলা থেকে পায়ে হেটে মোগরায় গিয়ে বোর্ডিং এর খোরাকী বাবদ টাকা আনতে হত। তিনি একজন "জনমঙ্গল" সমিতির নেতৃস্থানীয় কর্মী ছিলেন। ঐ সময়ে জনমঙ্গল সমিতির কাজকর্ম অতি গোপনে ও সতর্কভাবে পরিচালিত হত বলেই জানতাম। মাঝে মধ্যে জনমঙ্গল সমিতির নামে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে হুমকী দিয়ে বিপ্লবাত্মক বুলি সম্বলিত লিফলেট্ ইত্যাদি উমাকান্ত স্কুলের দেয়ালে লাগানো দেখা যেত। কমঃ বীরেন দত্ত কমিউনিস্ট কর্মী হিসাবে তার কাজ-কর্মের ক্ষেত্র বা পার্টিগত ইউনিট সম্ভবত পূর্ব বাংলায়ই ছিল। প্রয়াত প্রভাত রায় ও বংশীঠাকুর কোনদিনই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেন নাই। কমরেড দত্ত আগরতলায় এলে তাদের সঙ্গে হয়ত যোগাযোগ করতেন এবং জনমঙ্গল সমিতির নামে কাজ করতেন।

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন পিস্তল চুরি ঘটিত ব্যাপারে আগরতলার শ্রীকান্ত দেববর্মা গত ১৯৩২ সনে কুমিল্লাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তিনি ১৯৩৮ সনে মুক্তি পান। মূল ঘটনাটি হচ্ছে ঐ সনেই আগরতলার লব্ধ প্রতিষ্ঠিত ডাঃ অমর ভট্টাচার্যের বাড়িতে (আখাউড়া রাস্তার দক্ষিণে V. M. হাসপাতালের পূর্বে ও R. M. S. চৌমুহনীর পশ্চিমে অমরধাম নামে জায়গাটি পরিচিত ছিল) ডাকাতি হয়, ডাকাতি করার সময় ঘটনাস্থলে পবিত্র পাল, শচীন্দ্র দত্ত ও কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী পালিয়ে যেতে না পেরে জনতার হাতে ধরা পড়েন। তাদের ধরার ব্যাপারে আগরতলার জয়নগর নিবাসী কণ্ট্রাক্টর শ্রীগিরীশ ভুইয়্যার বড়ভাই শ্রীশ ভুইয়্যা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বীরত্বপূর্ণ ও সাহসিকতার জন্য শ্রীশ ভুইয়্যা তৎকালীন মহারাজা বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুর কর্তৃক পুরষ্কৃত হয়েছিলেন। কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী হচ্ছেন বর্তমান ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তীর ভাই। তাদের যখন বিচার শুরু হল তখন অনুশীলন পার্টির নেতা অনন্ত দে ও অন্যান্য কর্মীদের মহা দুশ্চিন্তা হয়েছিল বলে জানা যায়। তখন আগরতলা জেল থেকে তাদের যেকোনভাবে মুক্ত করার জন্য ষড়যন্ত্র চলছিল। ষড়যন্ত্র প্রায় প্রস্তুত, শুধু একটি পিস্তল যোগাড় করার প্রয়োজন ছিল। শ্রীকান্ত দেববর্মা তখন সোনামুড়ায় প্রয়াত ললিত মোহন দেববর্মার বাসায় ছিলেন। প্রয়াত ললিত মোহন দেববর্মা (M. A. B. L) তখন সোনামুড়া বিভাগের বিভাগীয় হাকিম ছিলেন। অমিয় দেববর্মা তাহার বড় মেয়ে এবং প্রয়াত প্রভাত রায়ের ছোট মামার মেয়ে। স্বভাবতই পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা থাকার কথা। প্রয়াত প্রভাত রায় মামার পিস্তল অমিয় দেববর্মাকে দিয়ে চুরি করানোর জন্য ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। অতএব শ্রীকান্ত দেববর্মাকে সোনামুড়া থেকে আগরতলায় খবর দিয়ে আনানো হয়। শ্রীকান্ত দেববর্মা প্রভাত রায়ের বাড়িতে এসেই তৎকালীন দলীয় নেতা অনন্ত দেকেও দেখতে পান। তিনজনে বসে সমস্ত প্রোগ্রাম ঠিক করে শ্রীকান্ত দেববর্মা সোনামুড়া ফিরে যান। তাদের সিদ্ধান্ত

মতো শ্রীকান্ত দেববর্মা অমিয়দাকে দিয়ে তার বাবার পিস্তল চুরি করিয়ে কুমিল্লার পথে রওনা হন। দারুন বর্ষা, গোমতি নদীর জল নাকি বিপদজনক অবস্থায়, খেয়াঘাটের মাঝিনরাও নৌকা দিয়ে মানুষ পার করা বন্ধ করে দিয়েছেন, শ্রীকান্ত বাবু উপায়ান্তর না দেখে শেষ পর্যন্ত সাঁতার দিয়ে নদী পার হয়ে যথাসময়ে পূর্বের সিদ্ধান্ত মতো কুমিল্লার নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হন। অনন্ত দে-ও দাঁড়িয়ে সবুজ রুমাল নাড়া দিতেছিলেন। তৎক্ষণাৎ শ্রীকান্তবাবু অনন্তদের হাতে পিস্তলটি তুলে দেন। সাদা পোষাকে পুলিশ ও I B সহ ওৎ পেতে ছিল নাকি। অনন্ত দে ও শ্রীকান্ত দেববর্মা পালানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। তবে অনন্ত দে ধরাপড়ার আগে পিস্তলটি নাকি ড্রেইনে ছুঁড়ে ফেলে দেন। দুজনই গ্রেপ্তার হলেন, পিস্তলটিও সঙ্গে সঙ্গেই নাকি পুলিশ তুলে নিয়েছিল। অনন্ত দে নাকি পুলিশকে মারার জন্য পিস্তল তাক করেছিলেন। কিন্তু কি একটা গণ্ডগোল হওয়ায় ব্যর্থ হন। শ্রীকান্তবাবুকে নাকি ধরা পড়ার পর অস্বাভাবিক দৈহিক নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল, এই খবর শুনতে পেয়ে প্রভাতদা নাকি সুশীল দেববর্মা মারফৎ সোনামুড়ায় অমিয়দার কাছে চিঠি পাঠান, চিঠির বিষয় হচ্ছে শ্রীকান্ত ও অনন্ত দে পিস্তল সহ ধরা পড়েছে, তুমি সাবধানে থেকো ইত্যাদি। প্রভাতদার স্বাক্ষরযুক্ত চিঠিসহ সুশীল দেববর্মা কুমিল্লা রেল স্টেশনে ধরা পড়লেন। তাতে প্রভাতদাও সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার হন। প্রয়াত ললিতমোহন দেববর্মা (বিভাগীয় হাকিম) পরিবার পরিজন সহ জঙ্গলপথে হাতীর পিঠে করে আগরতলায় চলে আসেন। কত বিড়ম্বনা পেতে হয়েছিল এই প্রসঙ্গ টেনে লাভ নেই। অনন্ত দে ও শ্রীকান্ত দেববর্মাকে যখন কুমিল্লা জেলে নেওয়া হয়েছিল তখন বীরেন দত্ত, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ, বীরেন দত্তের ভাই জিতু দত্ত ও প্রেমাংশু চৌধুরী প্রমুখও কুমিল্লা জেলে আটক ছিলেন। শ্রীকান্ত দেববর্মা ও অনন্ত দে'র গ্রেপ্তারের প্রায় এক বৎসর আগেই নাকি বীরেন দত্ত ও অন্যান্যরা অন্যকারণে ধরা পড়েন, অবশ্য সকলেই অনুশীলন পার্টির দলের লোক ছিলেন। শ্রীকান্ত দেববর্মার বক্তব্য মতো তখন ত্রিপুরা রাজ্যে জনমঙ্গল সমিতি গঠিত হয় নাই। আটক বন্দীরা সকলেই অনুশীলন পার্টির লোক ছিলেন। তখন ইংরেজ সাহেব হত্যা করাই নাকি তাদের কর্মকাণ্ডের প্রধান লক্ষ্য। আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করার প্রয়োজনে ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহ করা হত। তাদের কাজকর্মের কেন্দ্রস্থল ছিল পূর্ব বাংলার কুমিল্লা শহর, ত্রিপুরাতে আত্মগোপন করার জন্য কর্মীরা মাঝে মধ্যে আসতেন। ১৯৩৮ সনে শ্রীকান্ত দেববর্মা মুক্তি পান। শ্রীকান্ত দেববর্মা প্রয়াত প্রভাত রায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত বললেও চলে।

উভয়ে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে প্রথমে "সবুজ পার্টি" গঠন করেন, মুষ্টি ভিক্ষা সংগ্রহ করেন এবং সংগৃহীত চাউল বিক্রী করে গরীব ছাত্রদের বই কেনার ব্যবস্থা করেন। প্রভাতদা নিজেই গরিব ছাত্রদের পড়াতেন। তখন পর্যন্ত জনমঙ্গল সমিতি গঠিত হয়েছে বলে শ্রীকান্ত দেববর্মা বলেন নাই। গত ১৯৩১

ও ১৯৩২ সনে বীরেন দত্ত কুমিল্লা জেলে আটক থাকা অবস্থাতে কি করে ত্রিপুরা বা আগরতলায় এসে জনমঙ্গল সমিতি গঠন করলেন এবং ১৯৩১ সনে ত্রিপুরার রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনমঙ্গল সমিতি আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন? শ্রীকান্ত দেববর্মার মতো বীরেন দত্তের পুস্তিকার উক্তি সর্বৈব মিথ্যা বলেই তিনি মনে করেন। বীরেন দত্ত অন্য জেলে স্থানান্তরিতও হয়েছিলেন।

অতঃপর বীরেন দত্ত মহাশয় ত্রিপুরা রাজ্যের তৎকালীন প্রশাসনিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার ভাসা ভাসা আলোচনা করেন, কিন্তু কোন ধারাবাহিকতা ও সঙ্গতি নেই। পুস্তিকার ২৫ পৃষ্ঠায় দত্ত মহাশয় আবার বলেছেন ১৯৩৮ সনে ত্রিপুরায় জনমঙ্গল সমিতি গঠিত হয়েছে। পুস্তিকার ১৯ পৃষ্ঠায় বীরেন দত্ত বলেছিলেন ১৯৩১ সনে ত্রিপুরার জনমঙ্গল সমিতির আন্দোলন এক বিশেষ চেতনা সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু কি করে? পুস্তিকার ২০ পৃষ্ঠায় বীরেন দত্ত মহাশয় বলেছেন ১৯৩৮—৩৯ সনে জনমঙ্গল সমিতির আন্দোলন অতি দ্রুত গ্রাম ও শহরে উপজাতি জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। অবশ্য বীরেন দত্ত বক্তব্যের সমর্থনে কোনরকম তথ্য ও ঘটনা দিয়ে প্রমান্য যুক্তি উপস্থিত করতে পারেন নি। ত্রিপুরায় তখন বীর বিক্রম মানিক্য বাহাদুরের প্রচণ্ড প্রতাপ। অতএব কমঃ দত্তের লিখিত উক্তি মতো ১৯৩৮-৩৯ সনে আগরতলা ও গ্রামাঞ্চলে উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে জনমঙ্গল সমিতির আন্দোলনের ব্যাপক প্রসারতা সম্পর্কে বাস্তবতার কোন সঙ্গতি নেই। বীরেন দত্ত মহাশয়ের এই উক্তি রীতিমত অতিরঞ্জিত বলেই অনুমিত হয়। জনমঙ্গল সমিতির মূল নেতৃত্ব হচ্ছেন প্রয়াত প্রভাত রায় ও বংশী ঠাকুর। প্রয়াত বংশী ঠাকুর (অমরেন্দ্র দেববর্মা) আমাদের ত্রিপুরা বোর্ডিং এর সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ছিলেন, প্রয়াত বংশী ঠাকুর-এর কাজকর্ম ও আচার আচরণ সম্পর্কে আমরা ছাত্ররা মোটামুটি ওয়াকিবহাল ছিলাম। প্রয়াত প্রভাত রায়ের সহিত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা সূত্র থেকে আমার যোগাযোগ ছিল। সপ্তাহে একদিন তিনি মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করতেন শ্রীকান্ত দেববর্মা মারফত। অত্যন্ত সীমাবদ্ধতার মধ্যে জনমঙ্গল সমিতির কাজকর্ম পরিচালিত হত বলেই আমি জানতাম। জনমঙ্গল সমিতির সংগঠনের কাজে প্রভাতদা মাঝে মধ্যে বিভিন্ন এলাকায় যেতেন।

কমঃ বীরেন দত্তের পুস্তিকাতে ২৫ পৃষ্ঠায় শেষ দিকে লেখা আছে ১৯৩৯ সনে ১লা মে তারিখে "ত্রিপুরা রাজ্যের কথা" পত্রিকা বের করা হয়েছিল। ২২-২-৮২সন পর্যন্ত নাকি চালু ছিল। এই পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন? ইহা কি তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির অথবা জনমঙ্গল সমিতির মুখপত্র ছিল কি না? বীরেন দত্ত মশায় কোন আলোকপাত করেন নাই। এই প্রসঙ্গে প্রকৃত তথ্য জানবার জন্য ত্রিপুরার বর্ষীয়ান কমিউনিস্ট কর্মী দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত মহাশয় ও শ্রীনিমাই দেববর্মাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। আলোচনা প্রসঙ্গে উভয়েই বীরেন দত্তের উদ্ধৃত বক্তব্যকে অত্যন্ত বাজে কথা বলে মন্তব্য করেছিলেন। নিমাই দেববর্মা

তৎকালীন কমিউনিস্ট কর্মী ছিলেন এবং কমঃ বীরেন দত্তের একজন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন।

শ্রীমণিময় দেববর্মার সংগৃহীত ও রক্ষিত পুরান পত্রিকার রেকর্ড থেকে জানা যায় ১৩৫৪ ত্রিংসনে অর্থাৎ ১৯৪৪ সনে ত্রিপুরার বার্তা পত্রিকাটি বের করা হয়েছিল। সম্পাদক ছিলেন বীরেন দত্ত মহাশয়, ১৯৫০ সনে "ত্রিপুরার কথা" পত্রিকা বের করা হয়। কাজেই ১৯৩৯ সনের ১লা মে তারিখে "ত্রিপুরা রাজ্যের কথা" বের করার কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

১৯৩৯ সনে ত্রিপুরার কোন পার্টির নেতা বা কর্মীর সাথে আমার প্রত্যক্ষ যোগসূত্র স্থাপিত হয়নি। কাজেই সঠিকভাবে আলোচনা সম্ভব নয়। তবে বীরেন দত্ত মহাশয়ের লিখিত বক্তব্যগুলির বাস্তবতা সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষনের প্রয়োজনীয়তা আছে।

গত ১৯৩৯ সনের ৩রা সেপ্টেম্বরে প্রথমে হিটলারের পরিচালিত জার্মান নাৎসী বাহিনী পোলাণ্ড আক্রমন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে পোলাণ্ডের অর্ধেক কেড়ে দিয়ে সোভিয়েত রাশিয়ার সহিত হিটলার অনাক্রমন চুক্তি করে। ১৯৩৯ সনের ৪ঠা সেপ্টেম্বর বৃটিশ সরকার জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তখন চেম্বারলিন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। বৃটিশের অবস্থা যখন কাহিল তখন উইনস্টন চার্চিল বৃটিশের প্রধান মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে ত্রিপুরার তৎকালীন রাজা প্রয়াত বীর-বিক্রম মাণিক্য বাহাদুর দেশভ্রমনের জন্য পূর্ব ও পশ্চিমে ইউরোপ ভ্রমণ করেন। বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুর পূর্ব ইউরোপে ভ্রমণ করায় সময় ইটালীর নাৎসী নেতা মুসলিনী ও জার্মানীর হিটলারের সহিত সাক্ষাৎ করেছেন বলে জানা যায়। অতঃপর তিনি লণ্ডন হয়ে আমেরিকায় যান এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য লণ্ডনে ফিরে আসেন। কিন্তু ভূমধ্যসাগরে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যাওয়ায় ঐ পথে দেশে ফেরা সম্ভব হয়নি। বীর বিক্রমকে বাধ্য হয়ে আমেরিকায় ফিরে যেতে হয়। এবং জাপান দিয়ে ঘুরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ঐ সময় লক্ষ্য করা গিয়েছে বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুরের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের গোলমাল ও অনিশ্চিত অবস্থা জেনে রাজ পরিবার, অমাত্যবর্গ ও রাজ্যের রাজভক্ত প্রজাবৃন্দ যথেষ্ট চিন্তান্বিত হয়ে পড়েছিল। রাজকীয় মহল রীতিমত শোকাচ্ছন্ন ছিল। কারণ পূর্ব প্রাচ্যেও যে কোন সময় যুদ্ধ লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করার সময় আগরতলায় প্রবেশের মুখে জনমঙ্গল সমিতির নেতৃদ্বয় প্রয়াত প্রভাত রায় ও প্রয়াত বংশী ঠাকুরের উদ্যোগে এক নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়ার সময় রাজ্যে গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তনের দাবিও করা হয়েছিল বলে জানা যায়। সন ও তারিখ জানা নেই। বীরেন দত্ত মহাশয় সেই সংবর্ধনা

সভায় উপস্থিত ছিলেন কিনা জানিনা। তৎসময়ে বৃটিশ সরকার ও ভারতীয় দেশীয় সামন্ত রাজাদের সরকারগুলি কমিউনিস্টদের শত্রু বলেই বিবেচনা করতেন, কিন্তু ১৯৪১ সনের ২২শে জুন জার্মান নাৎসী বাহিনী অনাক্রমন চুক্তি ভঙ্গ করে অতর্কিতভাবে সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করে। তখন সোভিয়েত রাশিয়া, বৃটিশ, আমেরিকা মিলিতভাবে ফ্যাসীবিরোধী যুদ্ধ জোট গঠন করে, নাম দেওয়া হয়েছিল মিত্র-বাহিনী। অনেক আলাপ আলোচনার পর ফ্যাসিস্ট বিরোধী যুদ্ধের তাৎপর্যের পক্ষে পৃথিবীব্যাপি জনমত সংগঠিত করার প্রয়োজনে বৃটিশ সাম্রাজ্যের উপনিবেশ ভারতসহ অন্যান্য দেশের কমিউনিস্ট আটক বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অবিভক্ত বাংলা দেশ কমিটির মুখপত্র হিসেবে "জনযুদ্ধ" নামে পত্রিকা বের করে প্রথমে জনতার দরবারে উপস্থিত হয়।

বীরেন দত্ত মহাশয় ঐ সময়েই মুক্তিপ্রাপ্ত বলেই অনুমিত হয়। কমঃ বীরেন দত্ত কি ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক গ্রেপ্তার বরণ করে জেলে আটক ছিলেন ? তিনি কত সনে গ্রেপ্তার হয়েছেন এবং কত সনে মুক্তি পেয়েছেন ? কমঃ বীরেন দত্ত আলোচিত স্মৃতি চারণ পুস্তিকায় এইসব মূল্যবান তথ্যগুলি কেন বেমালুম চেপে গেলেন ? এই সমস্ত ঘটনাগুলি কি কমঃ বীরেন দত্তের স্মৃতির জগৎ থেকে একেবারে মুছে গিয়েছে ? তিনি বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী, যে কোন তথ্য বাড়ীতে বসেই সংগ্রহ করার সুবিধা ছিল। ১৯৪১ সনে আগস্ট মাসে চীন বিপ্লব দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে আগরতলায় লাল নিশান নিয়ে মিছিল সংগঠিত করা, ১৯৪৩ সনে সাধারণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা, অপর দিকে নেত্রকোনায় সম্মেলন (পুস্তিকার- ২৬ পৃষ্ঠায়) ইত্যাদি কমরেড বীরেন দত্তের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা হিসাবে ভূমিকা থাকার কথা। কিন্তু ১৯৪৩ সনে কি নেত্রকোনায় সর্বভারতীয় কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ? ১৯৪২ সনে বাংলার দুর্ভিক্ষের সময় তিনি কোথায় ছিলেন ? ঐ সময় দুর্ভিক্ষপীড়িত বুভুক্ষু নরনারীর এক অংশ ত্রিপুরায় ঢুকে পড়েছিল। ত্রিপুরার রাজা বীর বিক্রম মাণিক্য বাহাদুর তখন বর্তমান বটতলা বাজারে লংগরখানা বানিয়ে আশ্রয় শিবির করে দিয়েছিলেন। তখন বর্তমান রবীন্দ্রভবনের দক্ষিণ দিকে বাড়ি রবি দত্তের নেতৃত্বে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে কিশোরকিশোরী দল গঠন করে মুষ্টি ভিক্ষা সংগ্রহ করা হত। এবং প্রয়াত সৌমেন ঠাকুর এর বাড়ীর সামনে খালি মাঠে খিচুড়ী রান্না করে দুর্ভিক্ষ পীড়িত বুভুক্ষু নরনারীদের খাওয়ান হত। কিশোরদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। শহরের দেববর্মা বাড়িতে শান্তি দত্ত আমাকে নিয়ে ঘোরাঘুরি করতেন। প্রয়াত রায়ের স্ত্রী শ্রীমতি হাসি রায় তখনও বিয়ে করেন নি, শান্তি দত্তের কাছেই তখন সোভিয়েত রাশিয়ার বিপ্লবের কথা শুনেছিলাম, মাঝে মাঝে রাত্রে উমাকান্ত একাডেমীর পশ্চিম দিকের টিনের ঘরে গোপনে মিটিং ইত্যাদি করা হত। কিন্তু খুব গোপনে মিটিং করা হত। কমঃ বীরেন দত্ত তখন কোথায় ছিলেন জানি না।

আমার সাথে কমঃ দত্তের পরিচয়ও ঘটে নাই। মধ্যপাড়ার কানু সেনগুপ্ত, হীরেন সেন, নীলু চৌধুরী ও রবি দত্ত প্রমুখ নেপথ্যে ছিলেন। শান্তি দত্তই সক্রিয় ছিলেন। এখন মূল প্রশ্ন হচ্ছে ১৯৪০, ১৯৪১, ১৯৪২ ও ৪৩ সন পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পুরাপুরি সময় ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বত্র প্রকাশ্যে সভা, মিছিল ইত্যাদি করার নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল। এমতাবস্থায় আগরতলার বুকে লাল নিশান নিয়ে ১৯৪১ সনে রাজকীয় নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে মিছিল বের করা রীতিমত বিশ্বাস করা কঠিন। কমঃ দত্তের লিখিত পুস্তিকার ২৬ পৃষ্ঠার বক্তব্যগুলির সহিত বাস্তবতার কোন সঙ্গতি নেই, কারণ ১৯৪৫ সনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠার সময় প্রকাশ্যে সভা সমিতি ইত্যাদি করা সম্পর্কে প্রসঙ্গত এই নিষেধাজ্ঞা নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল।

গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মুহূর্তে ১৯৪৫ সনে পূর্ব বাংলার ময়মনসিং জেলার নেত্রকোনায় (অধুনা বাংলাদেশ) সারা ভারত কৃষক সম্মেলন হয়েছিল। ঐ সম্মেলনে কমরেড বীরেন দত্তের প্রচেষ্টায় আগরতলার মনিপুরী ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের কিছু শিল্পীও যোগদান করেছিল। রাজকুমার মাধবজিৎ সিংহ দুইজন মনিপুরী নৃত্য শিল্পী মেয়ে সহ, বাঁশী বাদক কৃষ্ণনগর নিবাসী শ্রীনিমাই দেববর্মা ও একজন মুসলমান শিল্পী এবং হরিনাথ দেববর্মা (ত্রিপুরা বোর্ডিং এর ছাত্র) অন্যান্যদের মধ্যে কমরেড দেবপ্রসাদ সেনগুপ্তের স্ত্রী শ্রীমতী ভুলু সেনগুপ্ত, কানু সেনগুপ্তের বোন শ্রীমতি ঝুনু সেনগুপ্ত প্রমুখ, নেত্রকোনায় কৃষক সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন।

ঐ সম্মেলনে উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা প্রয়াত ঐরাবত সিংহের সহিত মাধবজিৎ রাজকুমারের সাক্ষাৎকার ঘটে। ত্রিপুরায় তখন কৃষক সমিতিও নেই। কৃষক প্রতিনিধি যাওয়ার প্রশ্নও উঠেনা, ব্যক্তিগতভাবে যদি গ্রামের কোন কৃষক গিয়ে থাকেন আমার জানা ছিল না। যারা ঐ কৃষক সম্মেলনে যোগদান করেছেন সকলকেই যদি কমঃ বীরেন দত্ত তৎ-সময়ের বিপ্লবী কমিউনিস্ট কর্মী বলে জাহির করে থাকেন—আমি একমত নহি, তবে সম্মেলনে যারা গিয়েছেন সকলেই মোটামুটি উৎসাহিত হয়ে এসেছেন। নেত্রকোনায় কৃষক সম্মেলনের সমস্ত ঘটনা আমাদের বোর্ডিং-এর ছাত্র হরিনাথ দেববর্মার মারফত শুনতে পেয়ে অত্যন্ত উৎসাহিত হয়েছিলাম। হরিনাথ দেববর্মা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছিল, এই প্রসঙ্গে পরে আলোচনা করব।

পুস্তিকার ২৬ পৃষ্ঠায় ত্রিপুরা জেলার হাসনাবাদে যে কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল—১৯৪০ সনের কথা লিখেছেন কিনা ? ১৯৪০ বাকি সংখ্যাটি অস্পষ্ট। কাজেই মন্তব্য করা উচিত হবে না। তবে নেত্রকোনা কৃষক সম্মেলনের পরে হাসনাবাদে এই কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ঐ সময় হুমায়ুন কবির-এর বিরুদ্ধে কমঃ জ্যোতিবসুর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। ১৯৪৬ সনের ঘটনা, কমরেড পি. সি. যোশী এই কৃষক সম্মেলনের প্রধান বক্তা ছিলেন। আমাদের জনশিক্ষা

সমিতির উদ্যোক্তাদের কমঃ বীরেন দত্তের প্রচেষ্টায় হাসনাবাদে কমরেড পি. সি. যোশীর সহিত সাক্ষাৎ, আমি, নীলমনি দেববর্মা (ডাঃ), হরিনাথ দেববর্মা, ও হরিচরণ দেববর্মা ঐ সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণ করেছিলাম। সম্ভবতঃ কমঃ 'সুধন্বা দেববর্মা'ও উপস্থিত ছিলেন। কমরেড যোশী তৎকালীন ত্রিপুরায় মহারাজার প্রচণ্ড প্রতাপের কথা ভেবে অরাজনৈতিক শিক্ষামূলক সংগঠন করে অগ্রসর হওয়ার কথা পরামর্শ দিয়েছিলেন। প্রথমেই রাজনৈতিক সম্পর্কযুক্ত বলে টের পেলে ত্রিপুরার সামন্ত রাজা অংকুরেই বিনষ্ট করে দেবে বলে সতর্ক করে দেন। তখনকার অবস্থার বিবেচনায় আমাদেরও তাই চিন্তা চেতনা ছিল। কমঃ বীরেন দত্তের উল্লেখিত ত্রিপুরার কৃষক প্রতিনিধিদের হাসনাবাদে কৃষক সম্মেলনে যোগদান করার কথা রীতিমত মনগড়া ছাড়া কিছুই নহে। কারণ আমি নিজে উপস্থিত ও প্রত্যক্ষদর্শী। তবে আগরতলা থেকে বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্র-যুবক ঐ কৃষক সম্মেলনে যোগদান করেছিল। ত্রিপুরায় তখন পর্যন্ত কৃষক সমিতি গঠিত হয়েছে বলে মনে হয় না। কাজেই কৃষক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করার প্রশ্নও উঠে না। আমরা জনশিক্ষা সমিতির উদ্যোগীরা কমঃ বীরেন দত্তের পরিচালিত কোন সংগঠনের সদস্যও ছিলাম না। কমঃ বীরেন দত্তের পুস্তিকার ৩২ পৃষ্ঠায় রিয়াং বিদ্রোহীদের প্রসঙ্গ আলোচনা করতে তৎকালীন কমিউনিষ্ট পার্টির ভূমিকা যেভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন বাস্তব অবস্থার সহিত ইহার কোন সঙ্গতি আছে কিনা? ইহা রীতিমত চিন্তনীয় ব্যাপার। জৈব তান্ত্রিক সাধু রতনমুনীর সহিত রিয়াং বিদ্রোহের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে পরামর্শ করার জন্য ১৯৪২ সনে নোয়াখালি জেলার ছাগলন্যাইয়া গ্রামে সাক্ষাৎকার ও আলোচনার প্রসঙ্গ কমঃ দত্তের জামাতা শ্রীবিমান ধর যেভাবে উল্লেখ করেছেন ইহার কোন বাস্তব ভিত্তি আছে বলে মনে করার কারন নেই। বিমানবাবু রতনমুনীকে মার্কসবাদী বিপ্লবী নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসী হয়েছেন।

সম্ভবতঃ কমঃ দত্তের বক্তব্য থেকেই হয়ত বিমানবাবু এ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। অথচ কমঃ বীরেন দত্ত তার স্মৃতিচারণ পুস্তিকাতে ৩২ পৃষ্ঠার শেষ লাইনে বলেছেন "যতটুকু জানা যায় রতনমুনীর সাথে পার্টির আলোচনা হয়েছিল", তিনি যদি সত্যিই ছাগলন্যাইয়াতে রতনমুনীর সহিত সাক্ষাৎ করে রিয়াং বিদ্রোহের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করে থাকেন তা' হলে "জানা যায়" এই কথাটি লিখতে যাবেন কেন? "জানা যায়" কথার অর্থ অনুমান ভিত্তিক, জামাতা বিমান-বাবুর লিখিত বক্তব্যকে সাহস করে সমর্থন করতে পারেন নি কেন? কাজেই উল্লেখিত ঘটনার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। রিয়াং বিদ্রোহের ঘটনাবলী ও রতন মুনীর আচার আচরণে মার্কসিস্ট আন্দোলনের কোনরকম প্রতিফলনও ছিল না।

কমঃ বীরেন দত্ত আবার বলেছেন (৩৩ পৃষ্ঠায়) রতনমুনী নাকি তখন জাপান আক্রমণকারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ইত্যাদি। রিয়াং বিদ্রোহীদের উপর অত্যাচার ও উৎপীড়নের প্রতিবাদে কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে কুমিল্লাতে

বিরাট মিছিল বের করা হয়েছিল ইহার সত্যতা কতটুকু জানিনা, তবে বর্তমানে ধর্মনগরের বাসিন্দা কণ্ট্রাক্টার সুবোধ মুখার্জী তৎসময়ে ত্রিপুরা জেলা কমিটির সম্পাদক ছিলেন। বৃটিশ অধিকৃত ত্রিপুরা জেলা বর্তমানে বাংলাদেশে। অধুনা বাংলাদেশ কুমিল্লাতে কমিউনিস্ট পার্টি'র অফিস ছিল। তিনিই একমাত্র তখনকার দিনে রিয়াং বিদ্রোহীদের উপর ত্রিপুরার রাজকীয় বাহিনীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে কুমিল্লাতে কমিউনিস্ট পার্টি'র উদ্যোগে বিরাট মিছিল করে প্রতিবাদ করার সঠিক উত্তর দিতে পারেন। তিনি আবার পুস্তিকার ৩৩ পৃষ্ঠার শেষ প্যারাগ্রাফে লিখেছেন "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমাপ্তের সমকালে এতবড় একটা বিদ্রোহের সমর্থনে কুমিল্লা, নোয়াখালি ও ত্রিপুরা কমিউনিস্ট পার্টি'র নির্ভুল হস্তক্ষেপ" ইত্যাদি উক্তির ঘটনাপ্রবাহের বাস্তবতার সহিত কতটুকু সঙ্গতি আছে জানি না। কারণ তৎসময়ে আগরতলা শহরের কিছু সংখ্যক পার্টি কর্মী হিসেবে যারা পরিচিত ছিলেন সকলেই কুমিল্লা বা ত্রিপুরা জেলা পার্টি ইউনিটের অন্তর্গত। কমঃ বীরেন দত্ত যে সময়ের ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন তখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় রাজ্যভিত্তিক বা আগরতলার কোন পার্টি ইউনিট গঠিত হয়েছে কিনা? এই সম্পর্কে বীরেন দত্ত মহাশয় পরিষ্কার কোন তথ্য ও ঘটনা উপস্থিত করতে পারেন নি। কোন ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার যদি সন ও তারিখ সহ তথ্য ও ঘটনা না থাকে শুধু বীরেন দত্ত মহাশয়ের লিখিত বক্তব্যকে সত্য বলে গ্রহণ করে নেওয়া সঙ্গত হবে না, কারন রাজার আমলে তৎসময়ে আগরতলায় মুষ্টিমেয় পার্টি কর্মীদের ইউনিট গঠিত হয়ে থাকলেও পার্টি'র সাংগঠনিক অবস্থায় রিয়াং বিদ্রোহের মত ঘটনাতে হস্তক্ষেপ করার মত পরিবেশ ছিল কিনা?—ইহারও বিচার বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা আছে।

বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আগরতলা রবীন্দ্রভবনে নাকি একটি ছায়া (Shadow) নাটক মঞ্চস্থ করা হয়েছিল, তাতে নাকি প্রয়াত বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুরের সহিত রিয়াং বিদ্রোহের ব্যাপারে সাক্ষাৎকারের দৃশ্য দেখানো হয়েছিল?

তাতে নাকি প্রয়াত পণ্ডিত গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, প্রয়াত প্রভাত রায় ও কমরেড বীরেন দত্তের ভূমিকা পর্দায় ছায়ামূর্তি অভিনয় করে দেখানো হয়েছিল। বীরেন দত্ত মহাশয়ের ছায়ামূর্তিকে নাকি অত্যন্ত উত্তেজিত-ভাবে প্রয়াত মহারাজা বীর বিক্রম মাণিক্য বাহাদুরের সহিত কথা বলতে দেখা গিয়াছিল। অবশ্য কমঃ বীরেন দত্তের কথিত উৎসাহী নাট্যকারদের মঞ্চস্থ নাটক দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। প্রয়াত প্রভাত রায় মহাশয়ের স্ত্রী শ্রীমতী হাসি রায়-এর কাছে এই মঞ্চস্থ ছায়া নাটকের ঘটনা শুনতে পেয়েছিলাম, শ্রীমতী হাসি রায় ও অন্যান্য বা যাদের রাজার আমল সম্পর্কে সামান্যতম হলেও ধ্যান-ধারনা ছিল অধিকাংশই এই মঞ্চস্থ ছায়া নাটক সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে রবীন্দ্র ভবনের হল ঘর থেকে হাসি বৌদি সহ ছি, ছি, বলে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

কমরেড বীরেন দত্তের পুস্তিকার ৩৪ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন—"জনমঙ্গল সমিতির প্রেসিডেণ্ট প্রয়াত গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা ও সম্পাদক প্রয়াত প্রভাত রায় আমাকে (বীরেন দত্তকে) স্মারকপত্র রচনা করে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী রানা বোধজং বাহাদুরের নিকট পেশ করার অনুমোদন দিয়েছিলেন",—কমঃ দত্ত তৎকালীন রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর সহিত অর্থাৎ রানা বোধজং-এর সহিত প্রয়াত গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা ও প্রয়াত প্রভাত রায় সহ সাক্ষাৎ করেছিলেন কিনা পুস্তিকায় সুস্পষ্ট কোন উল্লেখও করেন নাই। এই ব্যাপারে প্রয়াত বীর বিক্রম মাণিক্য বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎকারের কথা কমঃ দত্ত নিজেও স্বীকৃতি দেন নাই। এখানে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন ত্রিপুরা রাজ্যে তখন প্রধান মন্ত্রীই বলা হত যদিও ইংরেজী গেজেট Chief Minister লেখা হয়? কিন্তু বাংলা গেজেটে প্রধান মন্ত্রীই লেখা হয়। কাজেই chief কথার অর্থ মুখ্য ছিল না প্রধান ছিল।

মুখ্যমন্ত্রী কথাটা চালু ছিল না, কাজেই মঞ্চস্থ ছায়া নাটক যে সম্পূর্ণ মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত এই কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। ঘটনা যদি সত্য হয় তাহলে ইহা নিশ্চিতভাবেই ঐতিহাসিকগত বিকৃত। ইহা কমঃ দত্তের নির্লজ্জ আত্মপ্রচারের উগ্র প্রবণতা বলেই প্রমানিত হয়।

প্রসঙ্গত এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন শ্রীঅলীন্দ্রলাল ত্রিপুরার স্ত্রী রতনমুনীর ছোট ভাইয়ের মেয়ে। অলীন্দ্রবাবু বর্তমানে লাটিয়াছড়া গ্রামে বাড়ী করে বসবাস করছেন। অলীন্দ্রবাবুর স্ত্রী রতনমুনীর আত্মীয় ও একই পরিবারের লোক। তাঁদের উভয়ের সহিত রতনমুনীর প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হয়েছিল? অলীন্দ্রবাবুর স্ত্রী বলেন "জেঠার বিরুদ্ধে বৃটিশ সরকারের কোনরকম গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছিল বলে জানা নেই। অতএব চিটাগাং অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ফেরারী আসামী বলে অলীন্দ্রলাল ত্রিপুরা ও তার স্ত্রী মনে করেন না। তাছাড়া বীরেনবাবুর জামাতা বিমানবাবু রতনমুনীকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক বলে যে বক্তব্য রেখেছেন ইহার সত্যতা সম্পর্কেও উভয়েই বিশ্বাস করতে রাজী নহেন, কাজেই রতনমুনী সম্পর্কিত ঘটনা ও রটনা বিমানবাবুর লিখিত বক্তব্য সত্য?—না রতনমুনীর পরিবারের লোকদের বক্তব্য সত্য? ইহা সহৃদয় পাঠকবর্গ নিশ্চিতভাবেই বিচার বিবেচনা করবেন। অবশ্য বিমানবাবু শ্বশুর মহাশয় কমঃ বীরেন দত্তের কাছ থেকেই তথ্য সংগ্রহ হয়ত করেছেন। অলীন্দ্রবাবুর স্ত্রীর মতে রতনমুনী একজন তান্ত্রিক সাধু ও অরাজনৈতিক। রতনমুনীও রিয়াং বিদ্রোহের ঘটনাবলীর সহিত সর্বভারতীয় আইনী ও বেআইনী কোন রাজনৈতিক সংঠনের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল বলে ঘটনার বাস্তবতার কোন প্রমান নেই। কোন রাজনৈতিক সংগঠন ও নেতৃত্বের ভূমিকা রিয়াং বিদ্রোহের ঘটনাবলীর মধ্যে প্রতিফলিত ছিল না। ইহা সামন্ততান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারিতা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে রিয়াং পার্বত্য প্রজাদের স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ এবং রতনমুনী এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছেন, নিজস্ব চিন্তাচেতনার

কায়দায়। কাজেই রিয়াং প্রজাবিদ্রোহে কমঃ বীরেন দত্তের অথবা তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির কোন রকম ভূমিকা বা সংশ্লিষ্ট ছিল না, এবং হস্তক্ষেপের প্রশ্নও উঠে না। পরবর্তী সময় এই বিদ্রোহের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করার চেষ্টা করব। পুস্তিকার ৩৬ পৃষ্ঠায় কমঃ বীরেন দত্ত ''জন শিক্ষা সমিতির উদ্ভব' এই হেড লাইন দিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত রিয়াং বিদ্রোহের মূল্যায়ন করে তৎকালীন পত্রিকায় একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল"—এই কথা লিখেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে কমঃ দত্ত যে সময়ের কথা বলছেন তখন পার্টি পত্রিকার নাম ছিল "জনযুদ্ধ"। স্বাধীনতা পত্রিকা তখনও বের করা হয়েছে কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে। কারণ তিনি সন তারিখও উল্লেখ করেন নাই, এবং আচমকা পণ্ডিত জওহর-লাল নেহরুর ত্রিপুরার মহারাজাকে লিখিত চিঠির উল্লেখ করেছেন। ডিসেম্বর ৯, ১৯৪৫ সন। কমঃ বীরেন দত্তের পরিবেশিত পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর লিখিত চিঠির একটি লাইন উল্লেখ করছি—"আমি আরো জানতে পেরেছি যে ১৯৪০ এর আরম্ভ থেকেই সমস্ত সভা, মিছিল ও বিক্ষোভ প্রদর্শন রাজ্যটিতে নিষিদ্ধ এবং কোনরকম নাগরিক স্বাধীনতার অস্তিত্ব নেই"।

আমি নিজেও পরিষ্কার জানতাম জনশিক্ষা সমিতি গঠিত হওয়ার সময়ও এই প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছিল। অথচ কমঃ বীরেন দত্ত, রাজ্যব্যাপী সভা মিছিল নিষেধাজ্ঞা থাকা অবস্থাতেই ১৯৪১ সনে ,আগস্ট মাসে চীন দিবস পালনের উদ্দেশ্যে লাল নিশান নিয়ে আগরতলার বুকে প্রকাশ্যে মিছিল করার, কথা উল্লেখ করেছেন। ১৯৪৩ সনে সাধারণ পাঠাগার ও ১৯৪০ সনে আগরতলা শহরে রিক্সা শ্রমিকদের ও অন্যান্যদের নিয়ে প্রকাশ্যে মিছিল করে মে দিবস পালন করা ইত্যাদি উল্লেখ করেছেন। ১৯৩৯ সনে রায়পুর দাঙ্গার সময় কিছু সংখ্যক রিক্সা শ্রমিক হয়ত আসতে পারেন কিন্তু তৎকালীন আগত রিক্সা শ্রমিকদের নিয়ে রিক্সা সংগঠন করে আগরতলার বুকে প্রকাশ্যে মিছিল বের করার মত অবস্থা ছিল না। আগত উদ্বাস্তুদের উমাকান্ত একাডেমী স্কুলেই প্রথমে জায়গা দেওয়া হয়েছিল। আমি নিজেও উমাকান্ত একাডেমীর ছাত্র হিসেবে "স্বেচ্ছা সেবকের" কাজ করেছিলাম। কোনরকম রাজনৈতিক নেতা বা কর্মীদের তখন দেখি নাই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কমঃ দত্তের পরিবেশিত পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর লিখিত চিঠি যদি সত্য হয় তা হলে কমরেড বীরেন দত্ত রাজ্যব্যাপী নিষেধাজ্ঞার মধ্যে কি করে ১৯৪০—১৯৪১ সনে আগরতলার বুকে প্রকাশ্যে মিছিল বের করেছিলেন ?

দ্বিতীয় পর্ব

কাজেই কমঃ দত্তের লিখিত বক্তব্যগুলি পরস্পর বিরোধী এবং বাস্তবতার সহিত কোন সঙ্গতি নেই। তদুপরি জনশিক্ষা সমিতির উৎপত্তির সহিত পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর চিঠির কি সম্পর্ক ইহা বীরেন দত্ত মহাশয়ই বলতে পারেন।

জনশিক্ষা সমিতির উৎপত্তি সম্পর্কে কমঃ বীরেন দত্ত আদি-অন্ত সব জানেন, কিন্তু অতি দুর্ভাগ্যের সহিত বলতে হয় কমঃ বীরেন দত্তের ঐতিহাসিক সত্যঘটনাগুলিকে পর্যন্ত লেখার সৎসাহসিকতা নেই। তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে বাস্তব ঘটনাগুলিকে চাপা দিয়ে কমঃ দশরথ দেবের লিখিত প্রবন্ধ থেকে কোটেশনের পর কোটেশন তুলে দিয়ে দায়িত্ব খালাস করেছেন। ইহা অতীব সত্য কথা "জনশিক্ষা" সমিতির উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে কমঃ বীরেন দত্তের ভূমিকাকে বাদ দেওয়া যায় না। কমঃ দশরথ ঠিকই বলেছেন, "জনশিক্ষা সমিতি গঠনের নেপথ্যে প্রেরণাদাতা ছিলেন কমরেড বীরেন দত্ত (পুস্তিকার ৩৭ পৃষ্ঠায়)। আমি নিজেও জনশিক্ষা সমিতি গঠনের মূলে কমঃ দত্তের অবদানের কথা নিশ্চিত-ভাবেই স্বীকার করবো। কিন্তু মূল প্রশ্ন হচ্ছে "জনশিক্ষা সমিতি" গঠিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কমঃ বীরেন দত্তের সহিত কমঃ দশরথ, ও কমঃ সুধন্বা ও কমঃ হেমন্ত এর কোনরকম পরিচয় ও যোগাযোগ ছিল কিনা? কমঃ সুধন্বা শ্রীকাইল কলেজে পড়াশুনা করতেন, কমঃ দশরথ শ্রীহট্ট জিলার হবিগঞ্জ কলেজে পড়াশুনা করতেন, আর হেমন্ত দেববর্মাও রাজ্যসরকারের কৃষি বিভাগে চাকুরি করতেন। বীরেন দত্ত মহাশয়ের সহিত তাদের তিনজনের আলাপ পরিচয় বা সাক্ষাৎকারও ঘটে নাই। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে বীরেন দত্ত মহাশয় কাদেরকে প্রথমে জনশিক্ষা সমিতির মত প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য উৎসাহিত ও প্রেরণা যুগিয়েছিলেন? জনশিক্ষা সমিতি গঠিত হওয়ার পূর্বে উপজাতি যুবকদের মধ্যে কাদের সহিত বীরেন দত্ত মহাশয়ের ঘনিষ্ঠতা ছিল? জনশিক্ষা সমিতি গঠিত হওয়ার পূর্বে উপজাতি শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত যুবকদের প্রথম সম্মেলন আহ্বান করার ব্যাপারে কে বা কাহারা উদ্যোগ নিয়েছিলেন ইহা কমঃ দত্তের অজানা ছিল না। বীরেন দত্ত ঐতিহাসিক ঘটনা

প্রবাহের বাস্তবতাগুলিকে ইচ্ছাকৃতভাবে চেপে গিয়ে একমাত্র কমঃ দশরথ দেবই জনশিক্ষা সমিতির স্রষ্টা বলে অভিহিত করলেন কি করে? (পুস্তিকার ৩৮ পৃষ্ঠার মাঝামাঝি)।

কমরেড দশরথ উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম হতে পারেন। কিন্তু তিনিই একমাত্র স্রষ্টা এই কথা কেহ মেনে নিতে পারে না। ইহা রীতিমত অবাস্তব। বীরেন দত্ত সমস্ত ঘটনা জানা সত্বেও স্মৃতিচারণের নামে কমঃ দশরথ দেবের স্তুতি করেছেন। হয়ত কমঃ দশরথকে স্তুতি করে রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা (Statusquce maintain) বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা ছিল।

জনশিক্ষা সমিতির প্রাথমিক উদ্যোক্তা কারা? বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মুহূর্তেই সমগ্র ভারতবর্ষে জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন প্রায় উন্মাদনার রূপ নিয়েছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল। ত্রিপুরার পার্বত্য গ্রামাঞ্চলের অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ উপজাতি জনগোষ্ঠীর শহরাঞ্চলে অধ্যয়নরত ছাত্রদের মধ্যেও ভারতীয় জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ উদ্বেলিত করে তুলেছিল। এ রাজ্যে সামন্ততান্ত্রিক শাসন ও শোষনের নিস্কণ্টক পরিবেশ বজায় রাখার প্রয়োজনে সামন্ত রাজারা বরাবর উপজাতি জনগোষ্ঠীকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে শিক্ষা ও সভ্যতার আলো থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। ভারতবর্ষে স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে ত্রিপুরার রাজতন্ত্রও অবশ্যম্ভাবী কারনে অবসান ঘটবে, তখন এ রাজ্যের অনুন্নত, পশ্চাৎপদ, অজ্ঞ ও নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ কি হবে এই চিন্তা চেতনায় উপজাতি শিক্ষিত যুবকদের একাংশের মনে রীতিমত আন্দোলিত হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে আমরা বোর্ডিং-এর ছাত্র বা নেত্রকোনায় সারাভারত কৃষক সম্মেলনের পর তৎকালীন ছাত্র হরিনাথ দেববর্মার মারফৎ সম্মেলনের সমস্ত ঘটনা শুনতে পেয়ে দারুন উৎসাহিত ও আকৃষ্ট হয়েছিলাম, উক্ত সম্মেলনে আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে কমঃ বীরেন দত্ত খুবই চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু আমি যাওয়ার জন্য কথা দিয়েও শেষ পর্যন্ত যাওয়া বন্ধ করেছিলাম অনেক চিন্তা ভাবনা করে। তখন আমার এক নম্বর চিন্তা ছিল, আমি তখন বোর্ডিং এর মনিটর্, যদি কোন কারণে রাজ্য সরকারের কুনজরে পড়ি, বোর্ডিং থেকে বিতাড়িত হয়ে গেলে আমার পড়াশুনা অনিবার্য কারনে বন্ধ হয়ে যেত, দুই নম্বর ছিল নেত্রকোনা সম্মেলন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালিত কৃষক সম্মেলন। আমি যদি প্রত্যক্ষভাবে কমিউনিস্ট পার্টির সহিত জড়িয়ে পড়ি তাহলে পরবর্তী সময়ে উপজাতি ছাত্র যুবকদের ঐক্যবদ্ধ করার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে ইত্যাদি কারন। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর মুহূর্ত থেকেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে জাতীয় আন্দোলনের বিশ্বাসঘাতক ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দালাল ইত্যাদি বলে যে বিষোদ্গার ও ও প্রচার অভিযান আরম্ভ করেছিল তাতে দেশের অধিকাংশ মানুষ প্রভাবিত।

ইহার ফলে উপজাতি শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে যদি কেহ কেহ প্রভাবিত হয়ে থাকেন তাহলে স্বাভাবিক কারণেই কমিউনিস্ট পার্টি'তে জড়িয়ে পড়লে উপজাতি ছাত্র যুবকদের একটি সংগঠনে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হয়ে উঠবে না। ইহাই ছিল আমার চিন্তা চেতনার কারণ: কমঃ বীরেন দত্ত আমাকে কমিউনিস্ট পার্টি'তে প্রত্যক্ষভাবে টানার জন্য অনলস প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। নেত্রকোনা কৃষক সম্মেলনের পূর্বেই কমঃ বীরেন দত্ত বোর্ডিং-এ বারবার যেতে আরম্ভ করেছিলেন আমাদের কাছে, তিনি ছাত্রদের জমায়েতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সোভিয়েট্ রাশিয়ার বিপ্লবের কথা, কৃষক, শ্রমিক ও সর্বহারাদের বিপ্লবের কথা আমাদের বুঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। অনেক সময় কথা বলতে বলতে হাঁপিয়ে উঠতেন তবুও কথা বন্ধ করতেন না। এমন অনেকদিন গেছে খাওয়ার (দুপুরে কিংবা রাত্রে) সময় অতিক্রম হয়ে গেলেও তিনি যেতেন না, তখন আমরা অনেক সময় কমরেড বীরেন দত্তকে বোর্ডিং-এ খাওয়ার ব্যবস্থাও করে দিতাম। এইভাবে কমঃ বীরেন দত্তের সহিত আমার ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। সহজে পার্টি'র মধ্যে যোগদান করি নাই। বোর্ডিং-এর ছাত্রদের মধ্যে হরিনাথ দেববর্মা পার্টি'তে ও ডাঃ নীলমণি দেববর্মা ছাত্র ফেডারেশনে যোগদান করেছিল। পার্টি'তে সরাসরি যোগদান না করার কারণ সম্পর্কে কমঃ বীরেন দত্তকে বরাবর বুঝানোর চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তাতে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। অনেক সময় রাস্তাঘাটে পর্যন্ত ঠাট্টা করে "ঠাকুর সাহেব" ইত্যাদি বলে মস্করা করেছিলেন। আমার এখন পর্যন্ত পরিষ্কার মনে আছে—একদিন আমি বটতলা থেকে চুল কেটে বোর্ডিং-এ ফিরছিলাম তখন পথে বর্তমান হরিগঙ্গা বসাক রোড মেলার মাঠের দীঘির দক্ষিণ রাস্তায় ডাক দিয়ে আমাকে ঠাট্টা করেছিলেন: কমঃ দত্তের পিছনে একদল তথাকথিত বিপ্লবী ছাত্র যুবকদল পশ্চিম বটতলার দিকে রওনা হচ্ছিলেন। তখন কমরেড দত্তকে ডেকে হাসতে হাসতে বলেছিলাম—"বীরেনদা বিপ্লবের দিনে আপনার এই বাহিনীর কতজন শেষ পর্যন্ত আপনার সঙ্গে থাকবে জানি না কিন্তু আমাকে বিপ্লবের দিনে অবশ্যই সঙ্গী হিসাবে পাবেন, এই কথা যেন মনে রাখবার চেষ্টা করেন।" ১৯৪৮ সনে পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হওয়ার পর কমঃ বীরেন দত্ত যখন আত্মগোপন করতে যাচ্ছিলেন তখন অঘোর দেববর্মা ছাড়া তিনি কাকেও পাননি। এই কথা প্রসঙ্গত উল্লেখ করছি।

জনশিক্ষা সমিতির প্রাথমিক সম্মেলন আহ্বান করার পিছনে কমঃ বীরেন দত্তের প্রেরণা ও অবদান শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করব। একদিন আমি ও হরিনাথ দেববর্মা আলোচনা করে উপজাতি ছাত্র যুবকদের এক সম্মেলন আহ্বান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি এবং কমঃ দত্তের সহিত পরামর্শ করেছিলাম। তাতে তিনিও উৎসাহিত হয়ে অকুণ্ঠ সমর্থন করেছিলেন, তবে উপজাতি যুব ছাত্র সম্মেলনে কমঃ বীরেন দত্তের প্রকাশ্যে কোনরকম ভূমিকা রাখতে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। কারণ আমাদের Senior বা বয়োজ্যেষ্ঠ কমঃ সুধন্বা ও কমঃ দশরথের

সহিত তখন পর্যন্ত আমাদের প্রত্যক্ষ মত বিনিময় হয়নি। রাজনৈতিকগত কাহার কি মতামত তাও আমরা কেহই জানতাম না। যাতে প্রারম্ভেই রাজনৈতিকগত বিভ্রান্তি বা ভুল বোঝাবোঝি না হয় তার জন্যে কমঃ বীরেন দত্তকে নেপথ্যে পরামর্শদাতা হিসেবেই ব্যবহার করেছিলাম, আমি ও হরিনাথ দেববর্মা বোর্ডিং-এর রেজিষ্ট্রি খাতা থেকে প্রাক্তন ছাত্রদের নামের লিষ্ট বের করতে থাকি। তখন আমাদের সামনে এক মহা সমস্যা ছিল সম্মেলনের জায়গা কোথায় পাওয়া যাবে এবং খাওয়ার সংস্থান কিভাবে করা হবে? প্রয়াত হেমন্ত দেববর্মা তখন প্রাক্তন ছাত্র এবং রাজ্য সরকারের কৃষিবিভাগে চাকুরী করতেন। সম্মেলনের জায়গা ও খাওয়ার ব্যবস্থার জন্য আমরা প্রয়াত হেমন্ত দেববর্মার স্মরণাপন্ন হয়েছিলাম। আমাদের বোর্ডিং এর পশ্চিমদিকে পুরান রাজ্য সরকারের প্রেসের কাছেই তখনকার আমলে কৃষিবিভাগের একটি নার্সারী ছিল। কমঃ হেমন্ত দেববর্মা সাইকেল নিয়ে বাড়ী থেকে অফিস করতেন। আমি ও হরিনাথ দেববর্মা একদিন বিকালে অফিস ছুটি হওয়ার সময় উমাকান্ত একাডেমী স্কুলের সামনে গেটে প্রয়াত হেমন্ত দেববর্মার অপেক্ষা করতে থাকি। সাইকেলে করে বাড়ীতে ফেরার সময় আমরা দুইজন হেমন্ত দেববর্মাকে আটকিয়ে বোর্ডিং-এ নিয়ে গিয়েছিলাম এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে তাঁকে বললাম, তাতে প্রয়াত হেমন্ত দেববর্মা আমাদের প্রস্তাব শুনে এত উৎসাহিত ও আনন্দিত হয়েছিলেন ইহা বলার অপেক্ষা রাখে না। তিনি অতি উৎসাহের সহিত বলে উঠলেন—"সম্মেলন আমার বাড়ীতেই হবে এবং থাকা ও খাওয়ার সমস্ত দায় দায়িত্ব আমি একাই বহন করব." সম্মেলন ডেকে লোক জমানোর দায়িত্ব আমাদের উপর দেওয়া হয়েছিল। তারিখ তখনও ঠিক করি নাই, বোর্ডিং-এর আরও কয়েকজনের সহিত পরামর্শ করে কমঃ দশরথের সহিত যোগাযোগ করার সিদ্ধান্ত করা হল। আমি ডাঃ নীলমণি দেববর্মাকে সঙ্গে করে শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ কলেজে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম আমাদের প্রস্তাব ও ভাবনা শুনে তিনিও খুবই উৎসাহিত হলেন এবং তিনজনে আলোচনা করে তারিখও ঠিক করে ফেলেছিলাম। কমঃ দশরথ খোয়াই বোর্ডিং-এ গিয়ে প্রয়াত রবীন্দ্র দেববর্মা ও অন্যান্যদের সহিত আলোচনা ও সম্মেলনে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রন জানাতে বললেন। আমি ও ডাঃ নীলমণি দেববর্মা খোয়াই বোর্ডিং-এ গিয়েছিলাম এবং আমাদের সম্মেলনের ব্যাপারে আলোচনান্তে আগরতলায় ফিরে এলাম, খোয়াই থেকে এসেই বিভিন্ন এলাকায় চিঠি লিখেছিলাম। শুধু চিঠি দিয়েই যথেষ্ট মনে করার কারণ ছিল না। তখন আমি হরিনাথ দেববর্মাকে সঙ্গে নিয়ে সদর দক্ষিণে রওনা হলাম, বোর্ডিং-এর প্রাক্তন ছাত্রদের নামের লিষ্ট সঙ্গে করে নিয়েছিলাম।

আগরতলা থেকে বিশালগড়ে তখনও কোন বাস সার্ভিস চালু হয়নি, মাঝে মধ্যে ট্রাক কদাচিৎ আসা যাওয়া করতো। আমরা পায়ে হেটেই বিশালগড়ের পথে

রওনা হলাম। বড়জলা, চণ্ডীঠাকুরের বাড়ী, বিশ্রামগঞ্জ ও ধারিয়াথল গিয়েছিলাম। হেরমা বাড়িতে অনেক প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন। যোগেন্দ্র দেববর্মা, ব্রজকুমার দেববর্মা, সুরেন্দ্র দেববর্মা, হরিপদ দেববর্মা গদাধর দেববর্মা আরও অনেকে ছিলেন। আমি সম্মেলনের তাৎপর্য সম্পর্কে সকলকেই বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম। তখন পর্যন্ত সকলেই বেকার ছিলেন, সম্মেলনে যোগদান করার প্রতিশ্রুতি আদায় করে হরিনাথ দেববর্মা সহ সুতারমুড়ায় কমঃ সুধন্ব্যার বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তিনি বি. এ. পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে বাড়িতেই ছিলেন। গ্রামে তখন গরুর ব্যাধি সংক্রামিত হচ্ছিল। তিনি গো-সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। আমাদের আহূত সম্মেলনের তাৎপর্য কমরেড সুধন্ব্যাকে বললাম। তিনিও খুবই উৎসাহিত হলেন, এবং সম্মেলনে যোগদান করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তা সত্বেও আমরা দুইজন ঠিক করেছিলাম তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আসব। তাই কয়েকদিন সুতারমুড়ায় থেকে কমরেড সুধন্ব্যাকে সঙ্গে নিয়ে আগরতলার পথে রওনা হয়েছিলাম। সঙ্গে ঐ গ্রাম থেকে রাধামানিক দেববর্মাও আমাদের সঙ্গে এলেন। কমঃ সুধন্ব্যাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসার মূল কারন হল তিনি যদি সম্মেলনে যোগদান না করেন তাহলে আমাদের সম্মেলনের উদ্দেশ্যই সফল হবে না। কারণ তিনি আমাদের মধ্যে বড় এবং পড়াশুনার দিক দিয়েও অনেক উপরে। অর্থাৎ যেখানে গাছ নেই সেখানে নাকি কেরন গাছই বড়। অতএব কমঃ সুধন্ব্যাকে বাদ দিয়ে আমরা চিন্তাও করতে পারি না, চিঠি দেওয়া ছাড়াও বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে প্রত্যেকের কাছে এত অনুরোধ করা সত্বেও অনেকেই কথা দিয়েও সম্মেলন যোগদান করেন নি। আমার মনে আছে কেহ কেহ ঠাট্টাও করেছিলেন।

যাই হোক ১৯৩৫ ত্রিং সনের ১১ই পৌষ (১৯৪৫ সন) যথাসময়ে আমরা দুর্গা চৌধুরী পাড়াতে প্রয়াত হেমন্ত দেববর্মার বাড়ীতে সমবেত হলাম, যতটুকু আশা করা গিয়েছিল ততজনও উপস্থিত হয় নাই।

তবে কমরেড দশরথ খোয়াই বোর্ডিং-এর বেশ সংখ্যক ছাত্র সঙ্গে নিয়ে যথাসময়ে আগরতলায় পেঁছিলেন। খোয়াই বোর্ডিং-এর আগত ছাত্ররা প্রয়াত রবীন্দ্র দেববর্মা, কমঃ রামচরণ দেববর্মা সহ অন্যান্যরা আমাদের বোর্ডিং-এ আতিথ্য গ্রহণ করলেন। কিন্তু কমঃ দশরথ সোজা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহের বাড়ীতে গিয়ে উঠলেন। শচীন্দ্রলাল সিংহ এ রাজ্যের কংগ্রেসের নেতা, তখন কমঃ দশরথ দেবের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ ছিল, কমঃ দশরথের কাছ থেকেই জানতে পেরেছিলাম তিনি নাকি খোয়াই বিভাগীয় টাউন কমিটির একজন সক্রিয় কংগ্রেস সদস্য ছিলেন। ডাঃ নীলমনি দেববর্মাকে নিয়ে যখন হবিগঞ্জ কলেজে গিয়েছিলাম তখনই কথা প্রসঙ্গে জানতে পেরেছিলাম কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে তার (কমঃ দশরথের) ধ্যান ধারনা খুব ভাল ছিল না। অর্থাৎ তখনকার দিনে কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে কংগ্রেসীদের বিভিন্ন ধরনের কুৎসা প্রচারে কমঃ দশরথ রীতিমত প্রভাবিত। কমঃ সুধন্ব্যাও প্রয়াত হেমন্ত দেববর্মার কংগ্রেসীদের

সহিত কোনদিনই ঘনিষ্ঠতা ছিল না। তবে কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কেও ধ্যান ধারনা ভাল ছিল না। উভয়েই ব্যক্তিগতভাবে বংশী ঠাকুরের ভক্ত কিন্তু রাজনৈতিক-গতভাবে জড়িত ছিল না।

এই সমস্ত অবস্থার বিচার বিশ্লেষনে, আমি আমার সহায়ক কর্মীদের সহিত পরামর্শ করে যতটুকু সম্ভব উপজাতি ছাত্র ও যুবকদের প্রথম ঐতিহাসিক সম্মেলনকে রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত রাখার চেষ্টা করেছিলাম, প্রয়াত বংশীঠাকুর প্রয়াত প্রভাত রায় ও কমঃ বীরেন দত্তকে সম্মেলনে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রনও করি নি সম্মেলন যথা সময়ে আরম্ভ হয়েছিল। দুই দিন অধিবেশন চলেছিল। ত্রিপুরার অনুন্নত, পশ্চাৎপদ, অজ্ঞ ও নিরক্ষর উপজাতি জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক অবস্থার পর্যালোচনা করা হয়েছিল, কিন্তু পরিপার্শ্বিক অবস্থার বিচার বিবেচনায় প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার প্রসারতা সম্পর্কেই প্রধান আলোচ্য বিষয় হিসাবে স্থান পেয়েছিল, অরাজনৈতিক শিক্ষামূলক সংগঠন গড়ে তোলার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। আমার যতটুকু মনে হয় হেরমা বাড়ীর যোগেন্দ্র দেববর্মা (মাস্টার) "জনশিক্ষা সমিতি" নামকরন করে প্রস্তাব করেছিলেন এবং উপস্থিত সকলেই একবাক্যে সমর্থন করেছিলেন। একটি কেন্দ্রীয় কমিটি সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচন করা হয়েছিল। কিন্তু কর্মকর্তা হিসাবে যাদের নির্বাচিত করা হয়েছিল তাদের তৎমুহূর্তে আগরতলা থেকে কাজকর্ম চালানোর মত অবস্থা ছিল না। তাই আগরতলায় থেকে সমিতির কাজকর্ম পরিচালনা বা চিঠিপত্র আদান প্রদান ইত্যাদি করার জন্য আমাকেই কার্যকরী সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। জনশিক্ষা সমিতি গঠিত হওয়ার প্রাথমিক স্তরে আমিও সফলতার সহিত এই দায়িত্ব পালন করেছিলাম, কমঃ বীরেন দত্ত নেপথ্যে আমার সহায়ক ছিলেন।

জনশিক্ষা সমিতির সম্মেলনে প্রসঙ্গত এ রাজ্যে তখন পর্যন্ত প্রকাশ্যে সভা, মিছিল করার সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল। রাজকীয় আমলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরও কোন রকম ব্যক্তি স্বাধীনতা স্বীকৃত ছিল না। এই কথা জানা থাকা দরকার জনশিক্ষা সমিতির উদ্যোগেই এ রাজ্যে দ্বিতীয় মহাযদ্ধের পর প্রথম আইনত বলবৎ নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে প্রকাশ্যে জনসভা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আগরতলায় সম্ভবতঃ কর্নেল বাড়ীতে শ্রদ্ধেয় শিল্পী ধীরেন কৃষ্ণ দেববর্মার সভাপতিত্বে প্রকাশ্যে জনশিক্ষা সমিতির উদ্যোগে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। জনশিক্ষা নেতৃত্বের সহিত কমঃ বীরচন্দ্র দেববর্মাও একজন বক্তা ছিলেন।

অতঃপর আগরতলার মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির কর্মতৎপরতা আরম্ভ হতে থাকে। জনশিক্ষা সমিতি গঠিত হওয়ার পর আগরতলা শহরের মধ্যে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এবং জনশিক্ষা সমিতির আন্দোলন ঘুমন্ত উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার আগ্রহের স্পন্দন জাগিয়ে তুলেছিল।

জনশিক্ষা সমিতির মিটিং ডাকা হলে কমঃ দশরথ আগরতলায় এলেই বরাবর শচীনবাবুর বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করতেন। কমঃ দশরথের সহিত আমরাও শচীনবাবুর বাড়ীতে যেতাম, তখন শচীনবাবু আমাদের আদর করে গালে চুমু খেতেন। জনশিক্ষা সমিতি গঠিত হওয়ার প্রাথমিক স্তরে কমঃ দশরথ দেব শচীনবাবুর কত ভক্ত ছিলেন এবং আমি অত্যন্ত ধৈর্য ও সহনশীলতার সহিত কমঃ দশরথের পিছনে জোঁকের মত লেগে থেকে কিভাবে শচীনবাবুর মোহ কাটাতে সাহায্যে করেছি তা কমঃ বীরেন দত্তের অজ্ঞাত ছিল না, আমার এই কাজে কমঃ দত্তের সক্রিয় ভূমিকা ও পরামর্শ বরাবর সহায়ক ছিল। কিন্তু অতি দুর্ভাগ্য কমঃ বীরেন দত্ত সমস্ত জেনেও তৎকালীন ঘটনাপ্রবাহের বাস্তবতাকে বেমালুম চেপে কমঃ দশরথকেই "জনশিক্ষা সমিতির" স্রষ্টা বলে অভিহিত করলেন।

জনশিক্ষা সমিতির আন্দোলনের প্রাথমিক স্তরে কমঃ দশরথ দেব অধুনা বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জিলার হবিগঞ্জ কলেজে পড়াশুনা করতেন। আগরতলায় থেকে কেন্দ্রীয়গত নেতৃত্ব দেওয়ার অবস্থাও ছিল না। কমঃ সুধন্ব্যা নামে সভাপতি নির্বাচিত হলেও প্রাথমিক স্তরে আগরতলায় ছিলেন না. পরে অবশ্য তিনি উমাকান্ত একাডেমীতে শিক্ষকের চাকুরী গ্রহণ করে আগরতলা উমাকান্ত বোর্ডিং-এ অবস্থান করেন। কিন্তু চাকুরীরত অবস্থায় কমঃ সুধন্ব্যা ও প্রয়াত হেমন্ত দেববর্মার সমিতির কাজকর্ম সক্রিয়ভাবে পরিচালনা ও অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে সীমাবদ্ধতা ছিল। তৎসময়ে কমঃ বীরেন দত্তের সহিত তাদের কাহারও প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ ছিল না। মোটের উপর আমাকেই আগরতলায় থেকে সামগ্রিক যোগাযোগ ও দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালন করতে হত। আমার সহায়ক কর্মীরা ছিলেন হরিনাথ দেববর্মা, ডাঃ নীলমণি দেববর্মা, হরিচরণ দেববর্মা, শশাঙ্ক দেববর্মা, চিত্ত দেববর্মা ও ধর্মরায় দেববর্মা প্রমুখ। তবে খোয়াই বিভাগে কমঃ দশরথ দেবের সহায়ক কর্মীদের মধ্যে প্রয়াত রবীন্দ্র দেববর্মা, রামচরণ দেববর্মা, কুঞ্জ দেববর্মা (মাস্টার) চেবরী ও রাজনগরের প্রয়াত বীরেন্দ্র দেববর্মা (তালুকদার নামে পরিচিত) প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সক্রিয় কর্মীদের কর্মবণ্টন হিসেবে আমার দায়িত্বে ছিল প্রধানতঃ সদর দক্ষিণ (শহরের সংলগ্ন গ্রাম বাদে) উদয়পুর বিভাগ ও বিলোনিয়া বিভাগ, কমঃ সুধন্ব্যা ও কমঃ হেমন্তের দায়িত্ব ছিল অমরপুর ও সাবরুম বিভাগ, তদুপরি প্রয়াত হেমন্ত দেববর্মার সদর উত্তরের বিশেষ দায়িত্ব ছিল। কমঃ দশরথের দায়িত্ব ছিল প্রধানত খোয়াই। গ্রামে গ্রামে স্কুল সংগঠিত করে নামের লিস্ট করা ছিল আমাদের প্রাথমিক দায়িত্ব। এইভাবে আমরা প্রায় সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ৪৫০টি স্কুলের নামের লিস্ট সংগ্রহ করে তৎকালীন মহারাজা প্রয়াত বীর বিক্রম মাণিক্য বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করে ৪৫০টি স্কুলের নামের লিস্ট দিয়ে সরকারী মঞ্জুরীর প্রার্থনা করে স্মারকলিপি পেশ করেছিলাম। সঠিক সন ও তারিখ মনে নেই। প্রয়াত

বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুর তৎক্ষণাৎ স্কুলগুলির মঞ্জুরী বিনা দ্বিধায় মঞ্জুর করে-ছিলেন। তবে প্রথমে তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমাদের দলে আগরতলা শহরের কেহ আছে কিনা ? বীর বিক্রম মাণিক্য বাহাদুর প্রয়াত বংশীঠাকুর ও প্রয়াত প্রভাত রায়ের কথাই বলেছিলেন। প্রসঙ্গত বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুর আগরতলার তৎকালীন ঠাকুর লোকদের সম্পর্কেও বড় শোষক বলে মন্তব্য করেছিলেন। আমাদের সমিতিতে আগরতলার কাহাকেও গ্রহণ না করার জন্য হুঁশিয়ারী দিয়েছিলেন। তৎসময় রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন ফাস্ট ত্রিপুরা রাইফেলস্ এর মেজর জেনারেল মিঃ ব্রাউন সাহেব। ত্রিপুরার অনুন্নত উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে তিনিও খুবই আগ্রহী ছিলেন। মিঃ ব্রাউন সাহেবের অবদানও অনস্বীকার্য। এখানে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন প্রয়াত বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎকারের সময় কমঃ দশরথ দেবকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। কারণ তিনি তখন হবিগঞ্জ কলেজে অধ্যয়নরত। কোন কারণে প্রয়াত বীরবিক্রমের কুনজরে পড়লে Stipend বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এই কারনেই কমঃ দশরথকে বাদ দেওয়া হয়েছিল।

কমঃ সুধন্বা, প্রয়াত হেমন্ত, ডাঃ নীলমণি দেববর্মা ও আমি বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করেছিলাম। এখানে জনশিক্ষা সমিতির সৃষ্টির পটভূমিকা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি মাত্র। বিস্তৃত আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করা আমার মূল লক্ষ্য নহে। জনশিক্ষা সমিতির সৃষ্টির মূলে উল্লেখযোগ্য তথ্য ও ঘটনাগুলি সঠিকভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। কাজেই বীরেনবাবু কমঃ দশরথকে জনশিক্ষা সমিতির স্রষ্টা বলে অভিহিত করেছেন কোন যুক্তিতে ? কমঃ দশরথের ব্যক্তিত্ব ও কর্মক্ষমতা কেহই অস্বীকার করবে না, তিনি জনশিক্ষা সমিতির স্রষ্টাদের মধ্যে অন্যতম হতে পারেন, কিন্তু তিনিই একমাত্র স্রষ্টা এই কথা কমঃ বীরেন দত্ত লিখলেও ইতিহাস মেনে নেবে না। জনশিক্ষা সমিতির সৃষ্টির মূলে যারা মূলত উদ্যোগী প্রয়াত হেমন্ত দেববর্মা ছাড়া প্রায় সকলেই জীবিত আছেন।

তৎকালীন রাজ্যের প্রশাসনিক অবস্থা

"জনশিক্ষা সমিতি গঠনের পূর্বে রাজ্যের প্রশাসনিক অবস্থা"

প্রয়াত বীর বিক্রম মাণিক্য বাহাদুরের আমলে এ রাজ্যের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বহিরাগত আমলারাই সর্বস্তরে সর্বেসর্বা ছিলেন। যথা : জ্যোতিষ সেন (অবসর প্রাপ্ত আই. সি. এস') প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। কমলা দত্ত মন্ত্রী (প্রভাবশালী), তীক্ষ্নবুদ্ধি সম্পন্ন বিজয়কুমার সেন মন্ত্রী (Political Department ও External affeirs) খগেন্দ্র চন্দ্র নাগ (Bar at law) হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস, গীরিজা প্রসাদ দত্ত অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার ত্রিপুরার পুলিশ কমিশনার ছিলেন। উল্লেখিত ব্যক্তিরা কেহই এ রাজ্যের অধিবাসী ছিলেন না। সারা জীবন কর্মরত থেকেও কেহই এ রাজ্যে বাড়ীঘর করেন নি। যথা, প্রয়াত বিজয়কুমার সেন প্রমুখ। তবে আমলাদের একাংশ এ রাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। তাদের সঙ্গে এ রাজ্যের মূল অধিবাসীদের হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। অনেকে আবার জিরাতিয়া প্রজাও ছিলেন। রাজ্যের প্রসাশনিক ক্ষেত্রে উপজাতি মোটেই ছিল না, এই কথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। বিভাগীয় পর্যায়ে কিছু অফিসার ছিলেন। মোটের উপর Head of the Department প্রায় নেই বললেই চলে। প্রয়াত সৌমেন্দ্র দেববর্মা (রেণুসাহেব নামে পরিচিত) এম. এ. হার্বার্ট (আমেরিকা) কিন্তু মন্ত্রীত্ব পান নি। তিনি শিক্ষা বিভাগের D. P. I পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রয়াত ললিত মোহন দেববর্মা এম. এ বি এল, পাশ করেও ত্রিপুরাতে চাকুরী না পেয়ে প্রথমে কলকাতাতে ওকালতি করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে প্রয়াত বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুর কলকাতার একজন প্রভাবশালী বন্ধুর চিঠি পেয়ে প্রয়াত ললিত মোহন দেববর্মাকে ত্রিপুরায় চাকুরীতে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনিও বহিরাগত আমলা প্রধানদের কুনজরে পড়ে বহু নাকানি চোবানি খেযে শেষ পর্যন্ত চাকুরী থেকে বরখাস্ত হয়ে শেষ জীবণে আদালতে ওকালতি করে জীবন কাটিয়ে গিয়েছেন। প্রয়াত ললিত মোহন দেববর্মার একজন ভাই প্রয়াত প্যারীমোহণ দেববর্মা তৎসময়ে বি. এস সি. পাশ করেও এ রাজ্যে চাকুরী না পেয়ে কলকাতার সাহেবদের বাগান শিবপুর বোটানিকেল গার্ডেনে ম্যানেজারের চাকুরী গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নাকি খুবই মেধাবী ছাত্র ছিলেন।

পার্বত্য এলাকার শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত উপজাতি যুবকদের রাজার আমলে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে চাকুরী পাওয়া কষ্টকর খুবই ছিল। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অনেক

আগে কামাল ঘাট বাজার সংলগ্ন গ্রামের প্রয়াত জীতেন দেববর্মা উমাকান্ত বোর্ডিং এর প্রাক্তন ছাত্র কুমিল্লা কলেজে আই এ. পাশ করেও রাজ্যের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে চাকুরী যোগাড় করতে পারেন নি। গত মহাযুদ্ধের সময় প্রয়াত বীর বিক্রম মাণিক্য বাহাদুর ত্রিপুর ক্ষত্রিয় মণ্ডলীর ভলাণ্টিয়ারদের নিয়ে রাজ্য রক্ষী বাহিনী গঠন করলেন তাতে তিনি লেফটেনাণ্ট পদে যোগদান করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ইহা অত্যন্ত অস্থায়ী ও ভলোণ্টিয়ার সংগঠন ছিল। সামান্য ভাতা পেতেন। পরে তিনি কলেরায় মারা যান। তদুপরি গত মহাযুদ্ধের আগেই আমতলীর শ্রীসুরেশ দেববর্মা উমাকান্ত একাডেমী থেকে ১৯৪০ সনে ম্যাট্রিক পাশ করেছিলেন তিনিও রাজ্যের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কোন চাকুরী যোগাড় করতে না পেরে চড়িলাম তহশীল কাছারীতে বৎসরের পর বৎসর বাড়ীতে খেয়ে শিক্ষানবীশের কাজ করেছিলেন পরবর্তী সময়ে তিনি জনশিক্ষা সমিতির স্কুলে শিক্ষকের চাকুরী গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। রাজার আমলে Class-V থেকে Class-X পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন এমন বহু উপজাতি বেকার যুবক তখন দুর্বিসহ জীবন কাটিয়েছে কিন্তু কাহারও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে চাকুরী হয় নাই, রাজ্যের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে উপজাতি যুবকদের চাকুরী পাওয়ার কোন উপায় ছিল না। উপজাতি যুবকদের একমাত্র রাজার বডিগার্ড বাহিনী অথবা ফাস্ট ত্রিপুরা রাইফেলস্ এ চাকুরী পাওয়া যেত। সৈন্য বাহিনীতে যোগদান করা সকলের মানসিকতা সমান ছিল না। লেখাপড়ার যোগ্যতা বিচারে সেখানেও পদ দেওয়া হত না। সৈন্য বিভাগ ও প্রয়াত বীর বিক্রমের মামাদের অর্থাৎ নেপালীদের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীন। প্রয়াত যুদ্ধজং ছিলেন সৈন্য বাহিনীর C. inc। কর্তা, কুমারও নেপালীদের দাপটই সৈন্যবিভাগে বেশী ছিল।

তৃতীয় পর্ব

"১৯৪৫ সনে ত্রিপুরায় রাজনৈতিক পার্টিগুলির তৎপরতা।"

জনশিক্ষা সমিতি গঠিত হওয়ার পর প্রচার অভিযানে প্রকাশ্যে মিছিল, জনসভা ইত্যাদি করার প্রশ্ন সম্মেলনে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছিল। আগরতলায় তখন কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি ও রাজ্য প্রজামণ্ডল থাকা সত্ত্বেও কোন রাজনৈতিক দলই সাহস করে যুদ্ধকালীন ঘোষিত ১৪৪ ধারা অগ্রাহ্য করে মিছিল, মিটিং ইত্যাদি করতে সাহস করেনি, ঘরোয়া বৈঠকেই প্রায় রাজনৈতিক দলের কাজকর্ম সীমাবদ্ধ ছিল, জনশিক্ষা সমিতি অরাজনৈতিক সংগঠন অতএব সম্মেলনে প্রকাশ্যে সভা ইত্যাদি করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। সম্মেলনের সিদ্ধান্ত যথাযথ কার্যকরীও করা হয়েছিল। তখন আগরতলা শহরে রাজনৈতিক দলগুলির কর্মতৎপরতা বাড়তে থাকে। আগরতলার ঠাকুর পরিবারের মাতব্বরগণ আবহমান কাল থেকে গ্রামের অজ্ঞ নিরক্ষর উপজাতি জনগোষ্ঠীর উপরে বিভিন্ন উপায়ে কর্তৃত্ব বা মাতব্বরী করে আসছিলেন। জনশিক্ষা সমিতি গঠিত হওয়ার পর তাদের চিরাচরিত মাতব্বরিতা করার সুযোগ আর থাকবে না ভেবে কিছু সংখ্যক ঠাকুর পরিবারের লোক রীতিমত দিশেহারা হয়ে উঠলেন। প্রয়াত জীতেন ঠাকুরের (এডভাইজার) নেতৃত্বে "পার্বত্য উপজাতি সেবা সমিতি" নামে একটি দল গঠিত হয়েছিল। এই সমিতি গঠিত হওয়ার পর প্রয়াত জীতেন ঠাকুর একাধিকবার জনশিক্ষা সমিতির নেতৃত্বের সহিত মিটিং করেছিলেন। জীতেন ঠাকুরের মূল বক্তব্য ছিল "কাজ তোমরাই করবে শুধু নেতৃত্বে আমাদের রাখো", জনশিক্ষা সমিতির নেতৃত্ব বরাবর তাদের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছিল। আমাদের সাহায্যে ব্যতীত পার্বত্য গ্রামাঞ্চলে পার্বত্য সেবা সমিতি গড়ে তোলার কোনরকম সুবিধাও ছিল না। সেটা মোঃ আব্দুল বারিক (খেদু মিঞা) এর নেতৃত্বে আঞ্জুমান ইসলামিয়া নামে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে এক শক্তিশালী সংগঠন গড়ে উঠেছিল। আব্দুল বারিক মিঞা নাকি জীবনের প্রথম দিকে হাতির মাহুত ছিলেন।

অতঃপর তিনি তৎকালীন রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী রাজা রানা বোধজং বাহাদুরের

গাড়ীর ড্রাইভার ছিলেন। গত মহাযুদ্ধের সময় প্রয়াত মহারাজ কুমার দুর্জয় কিশোর দেববর্মা ও অন্যান্যদের আনুকূল্যে কণ্ট্রাক্টারের কাজ পান। সিঙ্গারবিল বিমান বন্দর তৈয়ারীর বিভিন্ন কাজ গেদু মিঞা সাহেব তখন করতেন। একটি প্রবাদ আছে অবশ্য ঘটনা সত্য কিনা জানিনা—যেদিন জাপানীরা সিঙ্গার বিলে বোমা বর্ষন করেছিল সেইদিন গেদু মিঞা সাহেব নাকি বিল তুলতে সিঙ্গার বিলে গিয়েছিলেন। অফিসে নাকি সেনাবাহিনীর ইউরোপীয়ান সাহেবরাই ছিলেন। যে মুহূর্তে সাইরেন বেজে উঠেছিল উপস্থিত সাহেবরা নাকি পাগলের মত মোটরগাড়ী চেপে পালিয়ে যায়। তখন গেদু মিঞা সাহেব নাকি তাড়াহুড়া করে যতটুকু সম্ভব টাকার নোটের বাণ্ডিল তার গাড়ীতে তুলে খুব জোরে আগরতলার মুখে রওনা হয়েছিলেন। গেদু মিঞা সাহেব অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছিলেন। বোমার আঘাতে সমস্ত অফিস ঘরগুলি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। তখন আগর-তলায় গেদু মিঞার মত ধনী কেহ ছিল বলে মনে হয় না। শিবনগরে তিনি একটি মসজিদ করে গিয়েছেন। নরেন্দ্রকিশোর কর্তার বাড়ী কিনেছিলেন, জনশিক্ষা সমিতি স্কুল গঠনের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের প্রায় মুসলমান গ্রামে নিজের টাকায় টিনের ঘর করে মাদ্রাসা স্থাপন করে গিয়েছেন। ভোজন, মহা ভোজনের অন্ত ছিল না। প্রয়াত পণ্ডিত গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা আব্দুল বারিক মহাশয়ের বাড়ীতে প্রায় সব সময়েই পড়ে থাকতেন। তিনি গেদু মিঞায় পত্রিকা সম্পাদনা থেকে প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজও হয়ত করেছিলেন। তৎসময়ে ত্রিপুরায় উপজাতি জনগোষ্ঠীর পরেই মুসলিম সম্প্রদায়ের স্থান ছিল। আঞ্জুমান ইসলামিঞা এত শক্তিশালী ছিল কল্পনা করা যায় না। অবশ্য পরবর্তী সময়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের শিক্ষিত এক অংশ উদয়পুরের বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রয়াত ফরিদ মিঞা ও প্রয়াত আরমাণ আলী মুন্সী সাহেবদের নেতৃত্বে একদল আলাদা হয়ে ''মুসলিম প্রজা মজলিস" নামে সংগঠন করেন।

তা সত্বেও মৌলবী আব্দুল বারিক নেতৃত্বাধীন আঞ্জুমান ইস্‌লামিঞা দলই শক্তিশালী ছিল। প্রজামণ্ডল কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টির তৎপরতা ক্রমশ বাড়তে থাকে। কমিউনিস্ট পার্টির একক কিছু করার ক্ষমতা ছিল না। প্রজামণ্ডলে থেকেই কাজকর্ম করার চেষ্টা করেছিলেন। মহারাজকুমার কর্ণকিশোর দেববর্মাকে পেট্রনাইজ করে দ্বিজেন দে ও অন্যান্যরা ফরওয়ার্ড ব্লক সংগঠন গড়তে থাকেন। রাজ্য কংগ্রেস ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ ও প্রয়াত উমেশলাল সিংহের নেতৃত্বে সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে, এ রাজ্যের আমলা ও শোষক মহাজনেরা রাতারাতি খদ্দরের জামা কাপড় ও গান্ধীটুপী মাথায় দিয়ে কংগ্রেসে যোগদান করতে থাকে। তখন আগরতলা শহর রাজনৈতিক তৎপরতায় প্রায় চঞ্চল। প্রয়াত বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুর তখন রাজ্যের বাহিরে। তিনি শিলং-এ থেকে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চল রাজন্যবর্গ ও উপজাতি নেতাদের সহিত শলাপরামর্শ করে উত্তর পূর্বাঞ্চল স্বাধীন রাজ্য গঠন করা যায় কিনা এই প্রচেষ্টা

চালিয়ে যাচ্ছিলেন। পরবর্তী সময়ে আগরতলায় এসে পার্বত্য চিটাগাং এর মগ ও চাকমা প্রধানদের এবং লুসাই প্রধানদের আগরতলায় ডেকে এনে খুব গোপনে আলোচনা করেছিলেন। প্রয়াত বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুরের উত্তর পূর্বাঞ্চল পার্বত্য এলাকাগুলি নিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম রাজ্য গড়ে তোলার একটা স্বপ্ন ছিল। কিন্তু বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপজাতি জনগোষ্ঠীর নেতাদের সমন্বয় সাধন করা সম্ভব ছিল না। তবে প্রয়াত বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুর বেঁচে থাকলে ত্রিপুরার রাজনৈতিক অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াত বলা মুস্কিল ছিল। বিগত বৃটিশ আমলে প্রয়াত বীর বিক্রম মাণিক্য বাহাদুর ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের দেশীয় রাজন্যবর্গ কমিটির ছিলেন সভাপতি। তিনি রাজনৈতিক দিক দিয়ে অত্যন্ত বিচক্ষণ ছিলেন। ত্রিপুর সংঘ গঠনের মাধ্যমে "স্বাধীন ত্রিপুরা কি জয়" এই স্লোগান দেওয়ানোর ভিতর দিয়েই বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুরের সুদূর প্রসারী রাজনৈতিক লক্ষ্য অনুমান করা গিয়েছিল।

কমরেড বীরেন দত্ত প্রজামণ্ডলের আন্দোলনের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে পুস্তিকার ৩৯ পৃষ্ঠায় শেষ দিকে লিখেছেন প্রজার ভোট সরকার চায়, কৃষিঋণ মকুব ও তিতুন প্রথা বাতিল ইত্যাদি দাবির কথা উল্লেখ করেছেন। এই সমস্ত দাবীর আন্দোলনের পুরোভাগে নাকি একমাত্র প্রয়াত হেমন্ত দেববর্মা ও কমঃ সুধন্যা দেববর্মাই ছিলেন বলে মন্তব্য করেছেন। কমঃ বীরেন দত্তের এই মন্তব্য তৎকালীন প্রবাহমান ঘটনাগুলির সহিত কোন সঙ্গতি ছিল কিনা ইহা আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা আছে। কমঃ সুধন্যাকে গোয়ালিয়র দেশীয় রাজ্য সম্মেলনের প্রজা মণ্ডলের পক্ষে পাঠানো হয়েছিল বটে, তিনি গোয়ালিয়র প্রজা সম্মেলনে গিয়ে কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন বলে কোন ঘটনাও নেই। তিনি শুধু গিয়েছেন ও এসেছেন মাত্র। গোয়ালিয়র প্রজা সম্মেলনে গিয়েছেন বলেই রাজ্যের প্রজামণ্ডল আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন এই কথা বলার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না। কমঃ বীরেন দত্তের ভুলে যাওয়া উচিত হবে না তৎসময়ে কমঃ সুধন্যা উমাকান্ত একাডেমীতে শিক্ষকতার চাকুরী করতেন। প্রয়াত হেমন্ত দেববর্মা ও রাজ্যসরকারের কৃষিবিভাগে চাকুরী করতেন। বিশেষ করে বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুরের আমলে রাজ্যের প্রশাসনিক অবস্থা এত ভেঙ্গে পড়েনি যে প্রজামণ্ডলের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পুরোভাগেও থাকবেন আর রাজ্য সরকারের চাকুরীও ইহারা করিবেন, বাস্তবতার সহিত কোন সঙ্গতি নেই। কমঃ বীরেন দত্ত যে সময়ের কথা উল্লেখ করেছেন তখন কমঃ সুধন্যা ও প্রয়াত হেমন্ত দেববর্মা প্রজামণ্ডলের সাধারণ সভ্য পর্যন্ত ছিলেন না। জনশিক্ষা সমিতির মত অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রচার অভিযান করার সময়ও সুযোগমতো অত্যন্ত সতর্কতারও সীমিত অবস্থার মধ্যে তাঁদের কাজ করতে হয়েছিল, কমঃ সুধন্যা দেববর্মা অত্যন্ত সচেতন ব্যাক্তি, চাকুরীরত অবস্থায় কোনরকম বেপরোয়া ঝুঁকি নিয়ে কোন কাজ করেন নাই। আগরতলার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যখন জনশিক্ষা সমিতির কর্মীদের রাজনৈতিক

দলে টানার প্রচেষ্টা চালাতে থাকে তখন জনশিক্ষা সমিতির কর্মীদের মধ্যে বিতর্ক আরম্ভ হয়েছিল।

কোন রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করা উচিত ইহা নিয়ে জনশিক্ষা সমিতির কমিটির মধ্যে আলোচনা হয়েছিল। অনেক আলোচনার পর সামগ্রিক অবস্থার বিচার বিবেচনায় রাজ্য প্রজামণ্ডলকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। আমাকে জনশিক্ষা সমিতির প্রতিনিধি হিসাবে প্রজামণ্ডলে যোগদান করানোর জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। প্রজামণ্ডল কমিটি ও আমাকে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও যুগ্ম সম্পাদক হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছিল। প্রজামণ্ডলের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক তখন ছিলেন কমরেড বীরচন্দ্র দেববর্মা ও সভাপতি প্রয়াত ঠাকুর যোগেশ দেববর্মা। প্রয়াত কুঞ্জ দেববর্মার বাড়ীতে তখন প্রজামণ্ডলের কেন্দ্রীয় অফিস ছিল। প্রজামণ্ডলে স্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব একসঙ্গে কাজ করে থাকলেও তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি উল্লেখযোগ্য তেমন ছিল না। প্রজামণ্ডলের মূল নেতৃত্ব প্রয়াত বংশীঠাকুর ও প্রয়াত প্রভাত রায় কমঃ বীরেন দত্তকে বরাবর ভাল চোখে দেখতেন না। তদুপরি জনশিক্ষা সমিতির প্রভাবশালী নেতৃত্বের একাংশ কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষন করতেন। কমঃ বীরেন দত্ত ইহা ভালকরেই জানতেন। তিনি ইহাও জানতেন জনশিক্ষা সমিতির কর্মীদের প্রজামণ্ডলে যোগদান করানোর জন্য কে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কমঃ বীরেন দত্ত বাস্তব ঘটনাগুলিকে চাপা দিয়ে বিকৃত তথ্যগুলি পরিবেশন করেছেন। কারণ আমি তৎসময়ে কমঃ বীরেন দত্তের একান্ত অনুরাগী ও সক্রিয় কর্মী ছিলাম। আমি জোর দিয়েই বলতে পারি তখন আমার মত সক্রিয় কর্মী যদি না থাকত,-জনশিক্ষা সমিতি সংগঠনগতভাবে প্রজামণ্ডলকে সমর্থন করত কিনা যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ ছিল। অবশ্য আমি অকপটেই স্বীকার করব কমরেড বীরেন দত্তই আমাকে যুক্তি দিয়ে জনশিক্ষা সমিতির নেতৃত্বকে প্রজামণ্ডলে যোগদান করানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে কমঃ বীরচন্দ্র দেববর্মা, প্রয়াত ব্রজগোপাল ব্যানার্জি, কমঃ দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত, কমঃ আতিকুল ইসলাম প্রয়াত কুঞ্জেশ্বর দেববর্মা প্রমুখ কার্যকরী কমিটির সদস্য ছিলেন। উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রীয় কমিটির মধ্যে প্রাক্তন Depury Chief Secretary অমর সিনহা, রাজ্যসরকারের প্রাক্তন A. D. M বিমল দেব প্রমুখ ছিলেন।

ত্রিপুর সংঘ প্রসঙ্গ

কমঃ বীরেন দত্তের পুস্তিকায় ৪১ পৃষ্ঠায় ত্রিপুর সংঘ প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে কমঃ সুধন্বার লিখিত প্রবন্ধ থেকে অসংলগ্নভাবে কোটেশন তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তদুপরি পুস্তিকার ৩৯ পৃষ্ঠায় কমঃ বীরেন দত্ত ত্রিপুর সংঘের

সম্মেলনের ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের খোলাখুলি আলোচনার কথা যেভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তাতে ইহা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যেন কমঃ বীরেন দত্তই নেপথ্যে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কমঃ বীরেন দত্তের এই উক্তির বাস্তবতার সহিত কোন সঙ্গতি ছিল না। তৎসময়ে জনশিক্ষা সমিতির নেতৃত্ব কিংবা সক্রিয় কর্মীদের সহিত আমি ছাড়া কমঃ বীরেন দত্তের কাহারও সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল না। অবশ্য আমি নিজেও তখন পর্যন্ত ছাত্র ফেডারেশনের কিংবা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করি নাই। তবে ব্যাক্তিগতভাবে ঘনিষ্ঠতা কমঃ দত্তের সহিত ছিল। ডাঃ নীলমণি দেববর্মা তখন ছাত্র ফেডারেশনের সদস্য ছিল। কমঃ বীরেন দত্ত ডাঃ নীলমণি দেববর্মাকে ত্রিপুর সংঘের সম্মেলনের ব্যাপারে কোনরকম পরামর্শ দিয়ে থাকলেও আমাকে বাদ দিয়ে বাস্তবায়িত করার কোন অবস্থা ছিল না। কমঃ দশরথ দেব ত্রিপুর সংঘ সম্মেলনের সময় আগরতলায় ছিলেন না। ত্রিপুর সংঘ প্রসঙ্গে তিনি যা লিখেছেন অন্যের কথা শুনেই হয়ত লিখে থাকবেন। কমঃ সুধন্ব্যা দেববর্মার সহিত তখন পর্যন্ত কমঃ বীরেন দত্তের কোনরকম ঘনিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে কমঃ সুধন্ব্যা দেববর্মা ও কমঃ দশরথ দেবের মনোভাব পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। প্রজামণ্ডল কমিটিতে কমিউনিস্ট পার্টি ত্রিপুর সংঘ সম্মেলনের ব্যাপারে কোনরকম আলোচনা উত্থাপন করে থাকলেও প্রজামণ্ডল কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সম্পাদক হিসাবে আমার অজানা থাকার ছিল না। কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সম্পাদক কমঃ দেবপ্রসাদ সেনগুপ্তই পার্টির পক্ষে প্রজামণ্ডলের প্রতিনিধিত্ব করতেন।

ত্রিপুর সংঘ সম্মেলন প্রসঙ্গে কমঃ বীরেন দত্ত জনশিক্ষা সমিতি ও প্রজামণ্ডলের কোন কোন নেতৃত্বের সহিত খোলাখুলি আলোচনা করেছেন ইহা তথ্য ও ঘটনা দিয়ে তিনি উপস্থিত করতে পারবেন না, পারার কোন কারনও নেই। প্রয়াত প্রভাত রায় ও প্রয়াত বংশীঠাকুর জীবিত নেই কিন্তু তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক কমঃ দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত, কমঃ সুধন্ব্যা দেববর্মা ও আমি জীবিত আছি। কমঃ বীরেন দত্তের এই উক্তিকে কেহই সমর্থন করতে পারবে না। সমর্থন করার মত কোন বাস্তব ভিত্তিও নেই। কাজেই ত্রিপুর সংঘ সম্মেলনে কমিউনিস্ট পার্টির হস্তক্ষেপ বলে কমঃ বীরেন দত্ত যেভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন ইহার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। প্রয়াত বীর বিক্রম মাণিক্য বাহাদুরের সুদূরপ্রসারী চিন্তা চেতনা সম্পর্কে কমঃ বীরেন দত্তের কোনরকম ধ্যান ধারনা ছিল বলে আমার মনে হয়না। ত্রিপুর সংঘ সম্মেলনের সময় ত্রিপুরার রাজনৈতিক পরিস্থিতি রীতিমত অস্থির ছিল। বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে প্রয়াত বীর বিক্রম মাণিক্য বাহাদুর বিশ্ব পরিক্রমা করে এসে চিন্তা চেতনার জগতে স্বাভাবিক কারণে হয়ত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে। তিনি তার বশংবদ চেলা চামুণ্ডাদের নিয়ে লোক দেখানো নির্বাচন করে

সামান্যতম প্রশাসনিক দায়িত্ব দিয়ে ভুয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী হয়েছিলেন। প্রয়াত বীর বিক্রম মাণিক্য বাহাদুর জীবিতকালে মৌখিকভাবে ভারতীয় যুক্ত-রাষ্ট্রের ত্রিপুরাকে সংযুক্তির ইচ্ছা প্রকাশ করলেও রাজার মত ছিল অন্যরকম। তৎকালীন ভারতীয় জাতীয় নেতাদের মধ্যে প্রয়াত শরৎ বসুকে আগরতলায় এসে প্রয়াত বীর বিক্রম মাণিক্য বাহাদুরের সহিত আলোচনা করতে দেখা গিয়াছিল। কিন্তু আলোচনা সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়েছিল। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য নেতাদের সহিত গোপনে আলোচনা ইত্যাদি পূর্বেই আলোচনা করেছি।

প্রয়াত বীর বিক্রম মাণিক্য বাহাদুর শিলং থেকে এসেই প্রয়াত জীতেন ঠাকুরদের গঠিত পার্বত্য উপজাতি সেবা সমিতি ভেঙ্গেছিলেন। এবং রাজ্যের পার্বত্য উপজাতিদের সম্মেলন আহ্বান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সম্মেলনের প্রস্তুতির জন্য রাজবাড়ী উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের নীচের তলায় মিটিং আহ্বান করা হয়েছিল। জনশিক্ষা সমিতির প্রতিনিধিদেরও উক্ত মিটিং-এ উপস্থিত থাকার জন্য আহ্বান জানান হয়েছিল। কমঃ দশরথ দেব ও কমঃ সুধন্বা ঐ সময় আগরতলায় উপস্থিত ছিলেন না। আমি, হরিনাথ দেববর্মা, হরিচরণ দেববর্মা, ডাঃ নীলমণি দেববর্মা, রমেশ দেববর্মা, শশাঙ্ক দেববর্মা ও ধর্মরায় দেববর্মাদের নিয়ে উক্ত মিটিং-এ এ উপস্থিত ছিলাম। উক্ত মিটিং-এ আগরতলা শহরের গন্যমান্য ঠাকুর সাহেবরা বাদেও সদর দক্ষিণের বিশিষ্ট প্রভাবশালী ব্যক্তি প্রয়াত ওয়াখিরায় ঠাকুর, খোয়াই বিভাগের প্রয়াত রামকুমার ঠাকুর, হালামদভার প্রভাবশালী নেতা চন্দ্র রূপিনী, বিষাং সম্প্রদায়ের প্রধান প্রয়াত খগেন্দ্র রায়চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত মিটিং-এ কোন বিষয়ে বিতর্ক উপস্থিত হলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য উজীর সাহেব প্রয়াত কমলকৃষ্ণ দেববর্মা উপরতলায় অপেক্ষারত প্রয়াত বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুরের নিকট যেতেন এবং পরামর্শ নিয়ে আবার আসতেন। সম্মেলনের ব্যয় বরাদ্দ হিসাবে এক লক্ষ টাকা ধরা হয়েছিল। প্রয়াত বীর বিক্রম মাণিক্য বাহাদুর সম্যক ব্যয়ভার গ্রহণ করতে রাজী হয়েছিলেন। সম্মেলন পরিচালনার জন্য বিভিন্ন সাব কমিটি গঠিত হয়েছিল। সেচ্ছাসেবক দল গঠনের প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছিল, আমাদের পক্ষ থেকে কমঃ সুধন্বা দেববর্মাকে ভলেণ্টিয়ার প্রধান হিসাবে প্রস্তাব করা হয়েছিল এবং সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল। তবে প্রয়াত প্রভাত রায় ও প্রয়াত বংশীঠাকুরকে রাজা প্রস্তুতি কমিটির মিটিং-এ আমন্ত্রণও করেন নাই। কারণ উভয়কেই প্রয়াত বীর বিক্রম মাণিক্য বাহাদুর ভাল চোখে দেখতেন না।

আগত উপজাতি জনসাধারণের প্রত্যেকটি দফার ক্যাম্পগুলিতে থাকা, খাওয়া ও চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যাপারে তত্ত্বাবধান করার জন্য সেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছিল। সম্মেলনে উপস্থিত থাকার জন্য প্রচারের দায়িত্ব জনশিক্ষা সমিতির উপর দেওয়া হয়েছিল। জনশিক্ষা সমিতির কর্মীরাও প্রচারে

অংশগ্রহণ করেছিল। উক্ত প্রস্তুতি কমিটির মিটিং-এ প্রয়াত কমলকৃষ্ণ দেববর্মা সভাপতিত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

১৯৪৬ সনে বর্তমানের শিশুপার্কে পার্বত্য উপজাতির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সম্মেলনের স্থানের নাম দেওয়া হয়েছিল "মাণিক্য নগর"। ত্রিপুরার উপজাতি জনগোষ্ঠীর প্রত্যেকটি দফার জনসাধারণ যথেষ্ট সংখ্যক উক্ত সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেছিল। যথাসময়ে সম্মেলনের কাজ আরম্ভ হয়েছিল। কমঃ সুধন্ব্যা দেববর্মাকে সমস্ত ক্যাম্পগুলির আগত উপজাতিদের খাওয়ার টাকা বিলি বণ্টনের দায় দায়িত্ব দিয়ে সারাদিন ব্যস্ততার মধ্যে আটকিয়ে রেখে দিয়ে পরের দিন শেষ অধিবেশনে কমিটি গঠন করার প্রস্তুতি চলতে থাকে। প্রয়াত বীর বিক্রম মাণিক্য বাহাদুরের একান্ত ভক্তদের নিয়ে কমিটি গঠনের প্যানেল তৈরী করে প্রত্যেকটি ক্যাম্পের সর্দারদের কাছে নামের লিস্ট দিযে তাদের নির্বাচিত করার জন্য প্রচার অভিযান চালানো হয়েছিল। আমি ব্যক্তিগতভাবে ম্যাট্রিক পরীক্ষার ক্যান্ডিডেট ছিলাম। অতএব যতটুকু সম্ভব ঝামেলা বা দায়-দায়িত্ব এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু বিকালের দিকে আমার ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ বেশ কয়েকজন সর্দার বোর্ডিং-এ এসে আমাকে জানাল পরেরদিন কমিটি গঠনের জন্য প্রয়াত বীরবিক্রমের আজ্ঞাবহ চেলাচামুণ্ডাদের নামের লিস্ট ক্যাম্পের সর্দারদের পকেটে জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। কমঃ সুধন্ব্যা দেববর্মার কথা জিজ্ঞাসা করাতে সর্দারেরা বলেছিল "তোমাদের সুধন্ব্যার কোন পাত্তা নেই।" সর্দারদের কাছে এই কথা শুনার পর আমি অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করেছিলাম। বোর্ডিং-এর একদল ছাত্রদের নিয়ে আমি কমঃ সুধন্ব্যার খোঁজে বের হয়েছিলাম। অনেক খোঁজাখুঁজির পর শেষপর্যন্ত তৎকালীন ঠাকুর বোর্ডিং বর্তমানে তুলসীবতীর দুই নং হোস্টেলে খুঁজে বের করেছিলাম। সেখানে গিয়ে দেখেছিলাম কমঃ সুধন্ব্যা দেববর্মা লাল শালুতে বাঁধান মস্তবড় টাকার থলি নিয়ে টাকার হিসাব পত্র নিয়ে অতি ব্যস্ত। আমি কমঃ সুধন্ব্যাকে সমস্ত ষড়যন্ত্রের কথা বলেছিলাম। তিনি একজন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য হয়েও সম্মেলনের প্রোগাম সম্পর্কে কোন খবরই রাখেন নি তাতেও আমি বিরক্তবোধ করেছিলাম। হরিচরণ দেববর্মা, হরিনাথ দেববর্মা ও অন্যান্য ছাত্ররা তখন আমার সঙ্গে ছিল। তৎক্ষণাৎ কমঃ সুধন্ব্যাকে আমরা অন্য কাহারও হাতে তহবিলের দায় দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য বলাতে তিনিও প্রয়াত কুঞ্জেশ্বর দেববর্মার হাতে তহবিল বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। অতঃপর আমরা পরের দিন কমিটি গঠন করার জন্য আমাদের পক্ষের নামের লিস্ট তৈয়ারী করেছিলাম। কমিটি গঠনের তাৎপর্য বিশ্লেষণের জন্য প্রয়াত বংশীঠাকুরকে বক্তব্য রাখার জন্য জনসাধারণের পক্ষ থেকে সভাপতির কাছে অনুরোধ করা হয়। এখানে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন উজীর সাহেব প্রয়াত কমল কৃষ্ণ দেববর্মা প্রয়াত বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুরের একান্ত ঘনিষ্ঠ হলেও মানুষ হিসাবে ভাল বলে তার নাম আমাদের লিস্টে রাখা হয়েছিল। প্রয়াত

যোগেশ দেববর্মা রাজ্য প্রজামণ্ডলের সভাপতি ছিলেন। প্রয়াত প্রভাত রায়, প্রয়াত বংশীঠাকুর, প্রয়াত যোগেশ দেববর্মা, কমঃ সুধন্বা দেববর্মার নামসহ গ্রামের বিশিষ্ট সর্দারদেরও আমাদের লিস্টে নাম রাখা হয়েছিল। এইভাবে আমরা পাল্টা নামের লিস্ট তৈয়ার করে প্রচারের জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। এই ব্যাপারে প্রয়াত বংশী ঠাকুর, প্রয়াত যোগেশ ঠাকুর ও প্রয়াত প্রভাত রায় আমদের পরামর্শদাতা ছিলেন। এই সমস্ত নীতি নির্ধারণ করার ব্যাপারে আমার ভূমিকা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ছিল। তবে প্রচার অভিযান আমি সংগঠিত করে দিয়েছি মাত্র। প্রয়াত হেমন্ত দেববর্মা, প্রয়াত খগেন্দ্র দেববর্মা, শ্রীহরিচরণ দেববর্মা ও অন্যান্য বোর্ডিং এর ছাত্ররা দল বেঁধে ওইদিন অধিক রাত্র পর্যন্ত প্রতিটি ক্যাম্পে প্রচার অভিযান চালিয়েছিল, মূল নেতৃত্বে কমঃ সুধন্বা দেববর্মা ছিলেন। প্রয়াত বংশীঠাকুর প্রকাশ্যে প্রচার অভিযানে অংশগ্রহণ করেন নি, তবে তিনি নেপথ্যে মূল পরামর্শদাতা ছিলেন। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে পরীক্ষার্থী বলে আমি ওই দিন রাত্রে প্রকাশ্যে প্রচার অভিযানে অংশগ্রহণ করি নাই। পরের দিন প্রকাশ্য সম্মেলন আরম্ভ হওয়ার আগেই জনশিক্ষা সমিতির কর্মীরা অর্থাৎ বোর্ডিং-এর ছাত্ররা পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সভার মঞ্চ (উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যাক্তিদের বসার স্থান, রাজকীয় গদি ও বালিশ ইত্যাদি সহ) দখল করে বসে পড়লাম। তৎকালীন রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী প্রয়াত ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্মা প্রকাশ্য সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন। তিনি ছাপানো বিবৃতি পাঠ করে ওইদিনের সম্মেলনের উদ্বোধন করেছিলেন। অতঃপর প্রয়াত জীতেন ঠাকুর (এডভাইজার) সম্মেলনের তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ভাষণ ও তাদের প্রস্তুত প্যানেলের নামের লিস্ট সম্মেলনের সামনে উপস্থাপিত করেন। তিনি তাদের উপস্থাপিত প্যানেলের নামের লিস্টে যাদের নাম আছে তাদেরকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য সমাপ্ত করেন। কিন্তু প্রয়াত জীতেন ঠাকুরের বক্তব্য শেষ হওয়ার পর মুহূর্তেই পূর্ব সিদ্ধান্ত মতো উপজাতি সর্দারদের একাংশ প্রয়াত বংশীঠাকুরের বক্তব্য শুনতে চাই বলে দাবী করেছিলেন। প্রয়াত বংশীঠাকুর সভাপতির অনুমতির অপেক্ষা না করেই মাইক দখল করে কমিটি গঠনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে থাকেন। ভাল লোক বাছাই করে কমিটি করার জন্য জনসাধারণের কাছে আহ্বান রাখেন। প্রয়াত বংশীঠাকুরের বক্তব্যের পরে উপস্থিত পার্বত্য উপজাতি জনতার মধ্যে দারুন আলোড়ন সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহার পর সম্মেলনের মঞ্চ ও মাইক ইত্যাদি দখল করে সম্মেলন পরিচালনা ও কমিটি গঠন করার দায়িত্ব আমরাই গ্রহণ করেছিলাম। রাজার একান্ত আজ্ঞাবহদের বাদ দিয়ে আমাদের মনোনীত ব্যাক্তিদের নিয়ে কমিটি গঠিত হয়েছিল। এই সমস্ত ঘটনার জন্য রাজার একজন একনিষ্ঠ পার্শ্বচর বেসামাল হয়ে সোজা রাজবাড়ীতে দৌড়িয়ে গিয়ে রীতিমত হাঁপাতে হাঁপাতে প্রয়াত বীর বিক্রমের পায়ের কাছে নাকি লম্বা হয়ে পড়েছিলেন।

তার মূল বক্তব্য নাকি ছিল—"বংশীঠাকুর, সুধন্ব্যা, হেমন্তদের দল সম্মেলন দখল করেছে এবং কিছুক্ষণ পরে রাজবাড়ী দখল করতে আসবে" ইত্যাদি। প্রয়াত বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুর তখন মদের নেশায় বিভোর ছিলেন বলে জানা যায়। প্রয়াত বীর বিক্রম মাণিক্য বাহাদুরও তার সমস্ত উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় রীতিমত প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছিলেন বলে জানা যায়। অবশ্য প্রকাশ্য সম্মেলনে কোন রকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নি, শান্তিপূর্ণভাবেই সম্মেলন সম্পন্ন হয়েছিল। এই ঘটনার পর প্রয়াত বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুর বিরক্ত ও রাগান্বিত হয়ে সারারাত্র নাকি শুধু মদই খেয়েছিলেন। প্রয়াত বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুর ক্ষিপ্ত ও নেশাগ্রস্থ অবস্থায় তৎকালীন পুলিশ কমিশনার গিরিজাপ্রসাদ দত্ত মহাশয়কে ডেকে প্রয়াত বংশী ঠাকুর, প্রয়াত হেমন্ত দেববর্মা ও সুধন্ব্যা দেববর্মাকে গ্রেপ্তারের আদেশ দিয়েছিলেন। ওইদিন রাত্রে প্রয়াত হেমন্ত দেববর্মা বাড়ীতে যান নি বোর্ডিং-এ কমঃ সুধন্ব্যার সহিত ঘুমিয়েছিলেন। পরের দিন ভোর রাত্রে কমঃ সুধন্ব্যা দেববর্মা, প্রয়াত হেমন্ত দেববর্মা ও প্রয়াত বংশী ঠাকুরকে গ্রেপ্তার করে জেল হাজতে ঢোকানো হয়েছিল। তাতে আগত উপজাতি ক্যাম্পগুলিতে, প্রাক্তন সৈনিক ও উপজাতি ছাত্রদের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। এই বিক্ষোভ ও জটিল পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য তৎমুহূর্তে পরামর্শ করার মত কেহই ছিল না। আমি উপায়ান্তর হয়ে আমার জ্যাঠামহাশয় প্রয়াত হৃদয়রঞ্জন ঠাকুরের সহিত পরামর্শের জন্য গিয়াছিলাম। তিনি রাজ্য সরকারের প্রাক্তন পুলিশ কমাডেন্ট শ্রীহৃষিকেশ দেববর্মা মহাশয়ের পিতা। প্রয়াত হৃদয়রঞ্জন ঠাকুর ত্রিপুরা রাজ্য হাইকোর্টের জজও ছিলেন। জ্যাঠামহাশয়কে আমি সমস্ত ঘটনার কথা বলেছিলাম। তিনি তখন আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন তৎকালীন রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মার সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য এবং প্রধানমন্ত্রীর জামাতা শ্রদ্ধেয় শিল্পী ধীরেন কৃষ্ণ দেববর্মাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য বলেছিলেন।

আমিও জ্যাঠামহাশয়ের পরামর্শ মতো উজীর বাড়ীতে গিয়ে শ্রীধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মার সহিত দেখা করেছিলাম। পরিস্থিতির জটিলতা বলার পর তিনিই আমাকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মার বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন (প্রধানমন্ত্রীর বাড়ী বর্তমান মহিলা কলেজ)। বাড়িতে ঢুকেই প্রধানমন্ত্রীকে পেয়েছিলাম। তিনি দালানের সামনের ফুল গাছগুলি নিড়ানি দিয়ে খুঁচাচ্ছিলেন। জামাতা ধীরেন কৃষ্ণ ঠাকুর আমাকে প্রথমে পরিচয় করিয়ে দিয়ে কমঃ সুধন্ব্যা, প্রয়াত হেমন্ত দেববর্মা ও প্রয়াত বংশী ঠাকুরের গ্রেপ্তারের কথা বললেন। প্রধানমন্ত্রীও তখন বলে উঠলেন, "কিছুক্ষণ আগেই পুলিশ কমিশনার গিরিজাপ্রসাদ দত্ত এসে তাদের গ্রেপ্তারের কথা আমাকে জানিয়ে গিয়েছে।" আমি তখন প্রধানমন্ত্রীকে ঘটনার জটিলতা সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে বলেছিলাম। উপজাতি জনতা, প্রাক্তন সৈনিক, ছাত্রদের প্রচণ্ড বিক্ষোভের কথা ভালভাবেই বুঝিয়ে

বলেছিলাম। এবং এই বিক্ষোভ ফেটে পড়লে প্রচণ্ড লণ্ডভণ্ড হওয়ার আশংকা আছে বলেও জানালাম। প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মা অত্যন্ত শান্ত মেজাজে আমাদের বললেন তিনি নাকি জানতে পেরেছেন প্রয়াত বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুর সারারাত্র মদ্যপান করে তখন ঘুমোচ্ছিলেন। বিকেলে তিনি নিজে রাজার কাছে গিয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ধৃত তিন ব্যক্তির মুক্তির ব্যবস্থা করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। এবং যাতে উত্তেজনাবশে কোন রকম অপ্রীতিকর ঘটনা না হয় তার ব্যবস্থা করার জন্য আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। আমি ও তৎকালীন প্রধান মন্ত্রীর জামাতা শ্রদ্ধেয় ধীরেন কৃষ্ণ দেববর্মা আলোচনান্তে ফিরে এসেছিলাম। তিনিও আমাকে শান্ত পরিবেশ বজায় রাখার কথা বলেছিলেন। ইতিমধ্যে আমাদের বোর্ডিং-এর একদল ছাত্র প্রয়াত খগেন্দ্র দেববর্মার নেতৃত্বে "ধৃত বন্দীদের মুক্তি চাই" এই স্লোগান দিয়ে আগরতলা শহরের রাস্তায় পরিক্রমা আরম্ভ করেছিল। প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি থেকে ফিরে এসে অতিকষ্টে ছাত্রদের বুঝিয়ে বিক্ষোভ মিছিল বন্ধ করেছিলাম। অতঃপর প্রাক্তন সৈনিকদের ক্যাম্পে ও অন্যান্য ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শমতো স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সর্বত্রই অত্যন্ত মারমুখী উত্তেজনা বিদ্যমান ছিল। প্রাক্তন সৈনিকরা বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক। তাঁদের সংখ্যাও নেহাৎ কম ছিল না। সামান্য উস্কানী পেলেই ঐদিন আগরতলা লণ্ডভণ্ড হয়ে যেত। ঐ দিন সন্ধ্যার সময় রাজবাড়ী উজ্জয়ন্ত প্যালেসের সামনে প্রয়াত বীর বিক্রম মাণিক্য বাহাদুরের ভাষণ দেওয়ার কথা ছিল। তাতেও ধৃত বন্দীদের মুক্তির দাবীতে স্লোগান দেওয়ানোর ব্যবস্থা করেছিলাম। সম্মেলনের মূল স্লোগান ছিল "স্বাধীন ত্রিপুরা জয় হউক"। সন্ধ্যায় রাজবাড়ির সামনে স্বাধীন ত্রিপুরার স্লোগান দিয়ে মিছিল করে জমা হয়েছিল। বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুর যথা সময়ে এলেন, রাজার ছাপান ভাষণ প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্মা পাঠ করেছিলেন। যে মুহূর্তে স্বাধীন ত্রিপুরা স্লোগানের সাথে সাথে ধৃত বন্দীদের মুক্তি চাই বলে স্লোগান আরম্ভ হল তখনই বীরবিক্রম বিরক্ত হয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লেন। স্বাধীন ত্রিপুরা স্লোগানই রাজার নির্দেশিত মূল স্লোগান ছিল। তারপর ঐ দিন রাত্রেই রাজার নির্দেশে রাজবাড়িতে কমঃ সুধন্বা, প্রয়াত হেমন্ত দেববর্মা ও প্রয়াত বংশী ঠাকুরকে নেওয়া হয়েছিল। প্রয়াত বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুর নাকি তখন মদ্যপানে বিভোর ছিলেন। ক্ষণেক রুষ্ট ও ক্ষণেক তুষ্ট ইত্যাদি অভিনয় করে তিনজনকেই মুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কমঃ সুধন্বা দেববর্মা ও প্রয়াত হেমন্ত দেববর্মা ঐ সময় একদিন জেল হাজতে ছিলেন।

ত্রিপুর সংঘ সম্মেলনের উদ্ভূত পরিস্থিতির ঘটনাপ্রবাহের সহিত আমি সম্পূর্ণ জড়িত ছিলাম, আমি আমার জ্যাঠামহাশয় প্রয়াত হৃদয়রঞ্জন ঠাকুরের সহিত পরামর্শ করে শ্রদ্ধেয় শিল্পী শ্রীবীরেনকৃষ্ণ দেববর্মার সাহায্যে অনেক ধৈর্য ও

সহনশীলতার সহিত প্রাক্তন সৈনিক, ছাত্র ও জনসাধারণের প্রচণ্ড বিক্ষোভকে সামাল দিয়েছিলাম, আমি দায়িত্ব নিয়েই এই কথা বলতে পারি। পুস্তিকার দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে কমঃ বীরেন দত্ত যে লিখেছেন—যথা, "এই সংঘ গঠনের সময় জনশিক্ষা সমিতির নেতৃত্ববর্গ, প্রজামণ্ডলের প্রগতিশীল নেতৃবর্গ ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবর্গের মধ্যে গভীরভাবে আলোচনা হয়েছিল", কমঃ বীরেন দত্তের এই উক্তির কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। কারণ ত্রিপুর সংঘ সম্মেলনের সময় পর্যন্ত কমঃ বীরেন দত্তের আমাকে বাদ দিয়ে কিছু করার অবস্থা সৃষ্টি হয়নি। কাজেই কমঃ বীরেন দত্তের নেপথ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার কথাও রীতিমত অবান্তর। অবশ্য পরবর্তী সময়ে প্রয়াত বীর বিক্রম মাণিক্য বাহাদুর স্বাভাবিক হলে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে রাজার পরামর্শ মতো ত্রিপুর সংঘ কমিটি পুনর্গঠিত করা হয়েছিল। প্রয়াত অ্যাড্‌ভোকেট ললিত মোহন দেববর্মাকে সভাপতি ও কমঃ সুধন্ব্যা দেববর্মাকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছিল। প্রয়াত বীর বিক্রম মাণিক্য বাহাদুর প্রাথমিক স্তরে ত্রিপুর সংঘ প্রতিষ্ঠানকে পার্বত্য উপজাতিদের নূতন করে বন্দুকের লাইসেন্স দেওয়া ও লাইসেন্স নবীকরণ করা এবং উপজাতিদের সামাজিক বিচার কোর্টের আশ্রয় গ্রহণ না করে নিষ্পত্তি করার জন্য বাচনিকভাবে আদেশ দিয়েছিলেন। ত্রিপুরা রাজ্যে তখন রাজার ইচ্ছা বা আদেশই আইন ছিল।

বন্দুকের লাইসেন্স দেওয়া বা নবীকরণ করা ইত্যাদির ব্যাপারে তৎকালীন পুলিশ ও প্রশাসনিক আমলারা কিভাবে নীরিহ উপজাতিদের হয়রানী ও বে-আইনী মাশুল আদায় করতেন, ইহা তৎসময়ে কাহারও অজ্ঞাত ছিল না। ইহা উপজাতিদের উৎপীড়নের একটি যন্ত্র বলা যেতে পারে। এই বিষয়টি ত্রিপুর সংঘের সম্মেলনের সময় আলোচিত হয়েছিল। রাজ্যের প্রশাসনিক আমলা ও পুলিশদের অন্যায় শোষণ ও উৎপীড়ন থেকে উপজাতিদের রেহাই দেওয়ার জন্যই প্রয়াত রাজা সংঘকে এই অধিকার দিয়েছিলেন।

বন্দুকের লাইসেন্স দেওয়া বা নবীকরণ প্রসঙ্গে কমঃ বীরেন দত্তের পুস্তিকার ৪২ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় লাইনের শেষ থেকে "কিন্তু প্রজামণ্ডল এবং জনশিক্ষা আন্দোলনের মাধ্যমে কমিউনিস্ট পার্টি সংঘ অনুমোদিত বন্দুক আত্মরক্ষার জন্য সংগ্রহের পরামর্শ দিয়েছিলেন। যার ফলে রাজভক্ত সর্দারগণের হাতেই বন্দুক যায়নি, আন্দোলনের নেতাদের হাতেও বন্দুক এসেছিল।" কমঃ বীরেন দত্তের লিখিত এই উক্তির বাস্তবতা সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। তিনি যে সময়ের কথা পুস্তিকায় উল্লেখ করার চেষ্টা করেছেন তখন জনশিক্ষা সমিতি ও প্রজামণ্ডলের কর্মসূচীর মধ্যে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে বন্দুক সংগ্রহের কোনরকম প্রোগ্রাম বা সিদ্ধান্ত ছিল না। তদুপরি জনশিক্ষা সমিতি ও প্রজামণ্ডলের মূল নেতৃত্ব বা সক্রিয় কর্মীরা তখন পর্যন্ত ১৯৪৬ সালে ত্রিপুর সংঘ গঠনের সময় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদও গ্রহণ করে নাই। প্রসঙ্গত এখানে বলতে হয় কমরেড দশরথ দেব ত্রিপুর

সংঘ সম্মেলনের সময় আগরতলায় ছিলেন না। ত্রিপুর সংঘ গঠনের সময় প্রবহমান ঘটনাবলীর সহিত তাঁর কোন সম্পর্কও ছিল না। কাজেই কমঃ দশরথ দেবের ত্রিপুর সংঘ গঠনে কোন ভূমিকার প্রশ্নও উঠে না। কমঃ সুধন্ব্যা দেববর্মা ত্রিপুর সংঘ গঠনের ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। তিনিও কমিউনিস্ট প্রার্থীর সদস্য পদ গ্রহণ করা দূরের কথা তখনও পর্যন্ত কমঃ বীরেন দত্তের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কেও প্রতিষ্ঠিত হননি। কমঃ সুধন্ব্যা দেববর্মার কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে চিন্তা-চেতনার জগতে পরিস্কার ধারণা ছিল না এবং পার্টি বিরোধী মনোভাবেব প্রবনতাই বেশি ছিল। তবে তিনি কমঃ দশরথ দেবের মত কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন না। তিনি প্রয়াত বংশীঠাকুরের সহিত কমিউনিস্ট হিসাবে প্রজামণ্ডল সংগঠনে একসঙ্গে কাজ করে থাকলেও প্রায় প্রজা মণ্ডলের দুই নেতৃত্বের সহিত কমঃ বীরেন দত্তের সম্পর্ক ভাল ছিল না ইহা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি। তৎসময়ে ব্যক্তিগতভাবে জনশিক্ষা সমিতির সক্রিয় কর্মীদের মধ্যে আমি ছাড়া অন্য কাহারও কমঃ বীরেন দত্তের সহিত ঘনিষ্টতা ছিল না। অবশ্য তখনও আমি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করি নাই কাজেই কমরেড বীরেন দত্তের পুস্তিকায় লিখিত "ত্রিপুর সংঘ সম্মেলনে কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও বন্দুক সংগ্রহের" ব্যাপারে কমঃ বীরেন দত্তের পরামর্শ ইত্যাদি উক্তিগুলির কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। আমি দায়িত্ব নিয়ে এই কথা বলতে পারি ১৯৪৬ সনে ত্রিপুর সংঘ সম্মেলনের সময় কমঃ বীরেন দত্তের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অথবা নেপথ্যে কোন ভূমিকাই ছিল না। তদুপরি পুস্তিকার ৪২ পৃষ্ঠায় প্রথম প্যারাগ্রাফের শেষের দিকে রাজার উপজাতিদের রক্ষা কবচ হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থন প্রসঙ্গে লিখেছেন, "অপরদিকে রাজার রিজার্ভ সম্পর্কে পার্টি উপজাতিদের রক্ষা কবচ হিসাবে—এটাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন"। ১৯৪৬ সনে এই প্রসঙ্গ উঠেনি কাজেই কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থনের প্রশ্নও উঠে নাই, ইহার সহিত কোন সঙ্গতি নেই। কমঃ বীরেন দত্ত তাঁর লিখিত অবাস্তব উক্তিগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শুধু শুধু কমঃ দশরথ দেবের লিখিত কোটেশন গুলি তুলে দিয়ে বিভিন্নভাবে কমঃ দশরথ দেবকে তোয়াজ করেছেন।

কমরেড বীরেন দত্ত পুস্তিকার ৪২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন গত ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট বিভক্ত ভারত স্বাধীন হয়েছিল। এই বৎসরেই অক্টোবর মাসে নোয়াখালিতে ভয়াবহ দাঙ্গা সংঘঠিত হয়েছিল। কয়েক সহস্র উদ্বাস্তু আগরতলা শহরে প্রবেশ করেছিলেন। সরকারীভাবে নিউজিল্যাণ্ডের ব্যাপ্টিস্ট মিশনের সেক্রেটারি এম জি. ইউ. রানা বোধজং এবং মন্ত্রী তমিজউদ্দীনকে নিয়ে একটি রিলিফ কমিটি ত্রানের কাজ করেছিল"—ইত্যাদি। কমরেড বীরেন দত্তের লিখিত অংশটি এখানে তুলে দেওয়া হল। কমরেড বীরেন দত্তের জানা প্রয়োজন ১৯৪৭ সনের ১৭ই মে প্রয়াত বীর বিক্রম মাণিক্য বাহাদুরের মৃত্যুর পূর্বেই

রাজা রানা বোধজং বাহাদুরের মৃত্যু ঘটেছিল। প্রয়াত বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুরের মৃত্যুর সময় প্রয়াত ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্মা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। এমন কি ১৯৪৬ সনে ত্রিপুর সংঘ গঠিত হওয়ার সময়ও প্রয়াত ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্মাই প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ত্রিপুর সংঘ সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে তিনি ছাপান বিবৃতি পাঠ করেছিলেন। পরের দিন সন্ধ্যার সময় রাজবাড়িতে প্রয়াত বীর বিক্রম মাণিক্য বাহাদুরের ছাপান বিবৃতিও তিনিই পাঠ করেছিলেন। কাজেই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠবে ১৯৪৭ সনের অক্টোবর মাসে প্রয়াত রাজা রানা বোধজং বাহাদুর কি করে নোয়াখালী দাঙ্গার আগত উদ্বাস্তুদের সাহায্যের জন্য রিলিফ কমিটির সদস্য বা সভাপতি হলেন? তদুপরি সেই তমিজউদ্দীন খান প্রয়াত রাজা রাণা বোধজং বাহাদুরের মন্ত্রীসভায় ছিলেন না। প্রয়াত মহারাণী কাঞ্চনপ্রভাদেবী যখন রিজেণ্ট হিসেবে রাজকীয় ক্ষমতা গ্রহণ করেছিলেন তখন এক বহিরাগত আই. সি. এস. অফিসার এস ভি মুখার্জীকে প্রধানমন্ত্রী করে স্বল্পকালীন এক মন্ত্রীসভা গঠন করা হয়েছিল। প্রয়াত দুর্জয়কিশোর দেববর্মা, প্রয়াত নন্দলাল দেববর্মা ও মোঃ তমিজউদ্দীন খান প্রমুখ মন্ত্রীসভার সদস্য ছিলেন। সেই সময় প্রধানমন্ত্রী এস্. ভি মুখার্জী ও প্রয়াত দুর্জয় কিশোর দেববর্মা ষড়যন্ত্র করে পাকিস্থানের সহিত ত্রিপুরা রাজ্যকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়াসী হয়েছিলেন বলে আগরতলার জনসাধারণ দারুণভাবে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। প্রয়াত রমেন্দ্র কিশোর দেববর্মা এই বিক্ষোভ আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছিলেন। উমাকান্ত একাডেমীর সামনের ময়দানে বিক্ষোভ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রয়াত রমেন্দ্র কিশোর দেববর্মা এই বিক্ষোভ মিটিং-এ সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন, অতঃপর জনসাধারণের চাপে এস. ভি মুখার্জীর মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। এখানে প্রসঙ্গত বলা দরকার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্মন আমাকে একদিন কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে তিনি ঐ সময় দিল্লীতে গিয়ে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত জওহরলাল নেহেরু, প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সর্দার বল্লবভাই প্যাটেলের সহিত সাক্ষাৎ করে একজন সুদক্ষ আই. সি এস অফিসার ত্রিপুরাতে পাঠানোর অনুরোধ করেছিলেন। ত্রিপুরা তখনও ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করেনি। ত্রিপুরার মানচিত্র দেখে প্রয়াত পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ত্রিপুরা রাজ্যকে ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করানোর ব্যাপারে কোন উৎসাহই দেন নি। ত্রিপুরার ভৌগলিক অবস্থান দেখে তিনি নাকি মন্তব্য করেছিলেন ত্রিপুরা ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করলে ইহা ভারত সরকারের একটি Over burden হয়ে দাঁড়াবে। কারণ তিনদিকে বিদেশী রাষ্ট্র পাকিস্থান পরিবেষ্টিত ত্রিপুরার আয় বলতেও তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য ছিল না। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভারতবর্ষের সমস্যার অন্ত ছিল না। প্রয়াত ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্মার বক্তব্যের ইতিবাচক সাড়া না দিয়ে পণ্ডিত নেহেরু নাকি সময় নেই বলে এড়িয়ে গিয়েছিলেন।

প্রয়াত ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্মা নাকি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের কাছে গিয়েছিলেন। প্যাটেল সাহেব নাকি অনুরূপভাবে সময় নেই বলে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য জরুরী কাজে যেতে হবে বলে উঠে হাঁটা আরম্ভ করেছিলেন। কারণ ত্রিপুরার ভৌগলিক অবস্থান এবং তখন স্থলপথে ত্রিপুরার সহিত ভারতের কোন রকম সংযোগ রাস্তাও ছিল না। এই সমস্ত বাস্তব অবস্থা বিচার বিবেচনা করে হয়ত সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলও কোন রকম ইতিবাচক সাড়া না দিয়ে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। সর্দার বল্লভভাই যখন হেঁটে যাচ্ছিলেন তখন নাকি প্রয়াত ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্মন বল্লভভাই প্যাটেলের পিছনে হাটতে হাটতে বলতে থাকেন ত্রিপুরাতে ৭টি তেলের খনি আছে। এই কথা শুনামাত্র নাকি প্রয়াত বল্লভভাই প্যাটেল ঘাড় ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে যান। তখন প্রয়াত ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্মন নাকি তাড়াতাড়ি করে ম্যাপ বের করে তৈল খনির অবস্থানগুলি বোঝাতে থাকেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলও আবার ফিরে এসে নিজ আসনে বসে অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে প্রয়াত ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্মনের বক্তব্য শুনার চেষ্টা করেন। এবং অভিজ্ঞ অফিসার পাঠানোর প্রতিশ্রুতিও নাকি দিয়েছিলেন। প্রধান মন্ত্রী ও মন্ত্রী পরিষদ উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ইহারই ফলশ্রুতি হিসেবে ধুরন্ধর আই সি. এস অফিসার এ. বি চ্যাটার্জীর আগমন। কার্যতঃ দেওয়ান এ বি চ্যাটার্জীই ত্রিপুরা রাজ্যের হর্তা-কর্তা হয়ে উঠলেন। অবশ্য প্রয়াত ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্মনের বড় ছেলে প্রয়াত রমেন্দ্র কিশোর দেববর্মণকে চিফ্ সেক্রেটারী হিসাবে পুরস্কৃত করা হয়েছিল।

প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী, রাজা রাণা বোধজং বাহাদুরকে সভাপতি করে নোয়াখালি দাঙ্গায় আগত উদ্বাস্তুদের সাহায্য সহায়তা করার প্রয়োজনে যে রিলিফ কমিটি গঠিত হওয়া প্রসঙ্গে পুস্তিকার ৪২ পৃষ্ঠার শেষ প্যারাগ্রাফে প্রয়াত "বংশী ঠাকুরের ত্রিপুরা রাজ্য প্রজামণ্ডলের রিলিফ কমিটির আবেদন" শিরোনামায় প্রচারিত বিজ্ঞপ্তির তারিখও দেওয়া আছে ১৩৫৬ ত্রীং অর্থাৎ ১৯৪৬ সনে। কমঃ বীরেন দত্তের পরিবেশিত তথ্য প্রয়াত রাজা রাণা বোধজং বাহাদুরের সভাপতিত্বে যে রিলিফ কমিটি গঠনের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন ইহার যে বাস্তবতার সহিত সঙ্গতি নেই প্রয়াত বংশী ঠাকুরের বিবৃতির তারিখই প্রমাণ করে। কারণ মিটিং উদ্যোক্তাদের আমিও একজন সক্রিয় কর্মী ছিলাম।

পুস্তিকার ৪৫ পৃষ্ঠায় ১২-৭-৪৭ তারিখে প্রজামণ্ডলের সংখ্যায় প্রায় পাঁচ সহস্র ভলান্টিয়ার বাহিনী আগরতলায় অভিযান করেছিল। কমঃ বীরেন দত্তের পরিবেশিত এই তথ্য সম্পূর্ণ অবাস্তব, কাল্পনিক ও বিভ্রান্তিকর। প্রজামণ্ডলের পাঁচ সহস্র সশস্ত্র ভলান্টিয়ার অভিযানের কথা রীতিমত হাস্যকর কমঃ বীরেন দত্তের মত একজন দায়িত্বশীল কমিউনিস্ট পার্টির নেতার এই ধরনের মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করা রীতিমত দুর্ভাগ্যজনক।

১২-৭-৪৭ সনে উমাকান্ত একাডেমী স্কুলের প্রাঙ্গনে যে জনসভা অনুষ্ঠিত

হয়েছিল ইহা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি। এই মিটিং ছিল সর্বদলীয়। এ রাজ্যের বড় আমলা ও অরাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তি বিশেষও এই মিটিং উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন। মোটের উপর রাজনৈতিক দলমত নির্বিশেষে আগরতলার জনসাধারণ এই মিটিং-এ উপস্থিত ছিলেন। এর প্রস্তুতির মিটিং তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট সুলতান আহম্মদের কোয়ার্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। রাজ্য প্রজামণ্ডলের প্রতিনিধি হিসাবে আমি নিজেও উপস্থিত ছিলাম। স্বতঃস্ফূর্ততার মধ্যে এই মিটিং-এ ভাল সমাবেশ হয়েছিল। শহরের আশে পাশের উপজাতি গ্রামগুলি থেকে বেশ সংখ্যক উপজাতি জনতা উক্ত মিটিং-এ উপস্থিত ছিলেন। জমায়েত প্রায় হাজার চারেক হয়ত হয়েছিল। কাজেই সহস্রাধিক সশস্ত্র উপজাতি প্রজামণ্ডলের ভলোণ্টিয়ার হিসেবে মিটিং-এ উপস্থিত থাকার কথা সম্পূর্ণ অবাস্তব।

পুস্তিকার ৪৪ পৃষ্ঠায় লেখা আছে "বৃটিশ সরকার রাজমাতা প্রয়াত কাঞ্চন-প্রভাদেবীকে রিজেণ্ট হিসেবে ঘোষণা করে দিয়ে এস. ভি. মুখার্জীকে মুখ্যমন্ত্রী করে ত্রিপুরার প্রশাসনিক ব্যবস্থা হাতে নিয়েছিলেন।" কমঃ বীরেন দত্তের উপরিলিখিত বক্তব্যের কোন বাস্তব ভিত্তি আছে বলে মনে করি না।

কমঃ বীরেন দত্তের ভুলে যাওয়া উচিত হবে না এ রাজ্যে বৃটিশ সরকারের Political agent থাকলেও করদ রাজ্য হিসেবে গণ্য করা হত না—মিত্র রাজ্য হিসাবে গণ্য করা হত। দেশরক্ষা ও বিদেশী নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণতঃ বৃটিশ সরকারের উপর নির্ভরশীল হলেও আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ও প্রশাসনিক বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন সামন্ত রাজারা। কাজেই রাজার আমলে মুখ্যমন্ত্রী পদবী ছিল না। প্রধানমন্ত্রী পদবীই চালু ছিল। তাছাড়া ত্রিপুরা রাজ্য ক্ষুদ্র হলেও বৃটিশ সাম্রাজ্যের কোন প্রাদেশিক সরকারের অঙ্গ ছিল না।

প্রয়াত বীর বিক্রম মাণিক্য বাহাদুরের মৃত্যুর পর রাণী প্রয়াত কাঞ্চনপ্রভা দেবীকে রিজেণ্ট হিসাবে ঘোষণা করে এস. ভি মুখার্জীকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করাতে বৃটিশ সরকারের কোন রকম প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ভূমিকা ছিল বলে মনে হয় না। ত্রিপুরার আভ্যন্তরীন প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বৃটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের কোন রকম প্রামান্য নজীর কমঃ বীরেন দত্ত উপস্থিত করতে পারেন নি। কাজেই এই প্রসঙ্গে কমঃ বীরেন দত্তের বক্তব্য সম্পূর্ণ কাল্পনিক বলে অনুমিত হয়।

৪৪ পৃষ্ঠায় সেংক্রাক বাহিনী গঠন সম্পর্কে কমঃ বীরেন দত্ত যে সমস্ত বক্তব্য উপস্থিত করেছেন ইহাতে তৎকালীন ঘটনা প্রবাহের বাস্তবতার সহিত সঙ্গতির অভাব পরিলক্ষিত হয়।

কারণ আমি তখন প্রত্যেকটি ঘটনার সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলাম। তখন ত্রিপুরায় অস্থির রাজনৈতিক চঞ্চলতা বিদ্যমান ছিল। তদুপরি ত্রিপুরার

বাহিরে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্থান অধুনা বাংলাদেশে প্রায় সর্বত্র সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প এরাজ্যে আকাশে বাতাসে ধুমায়িত। ত্রিপুরায়ও যে কোন মুহূর্তে যে কোন জায়গায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটার সম্ভাবনা বিদ্যমান। পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু আগমনের স্রোত অব্যাহত। পাকিস্তান থেকে আচমকা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা যে ছিল না এই কথাও বলার উপায় ছিল না। মোঃ আব্দুল বারিক নেতৃত্বাধীন আঞ্জুমান ইসলামিয়া দলটিও খুবই সংগঠিত ছিল। তখন ত্রিপুরার প্রায় সমতল এলাকাগুলিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের ঘনবসতি ছিল। এবং পাকিস্থান সীমানা পর্যন্ত Contingous ছিল। এই সমস্ত রাজনৈতিক অস্থিরতার পরিপ্রেক্ষিতে একদিন প্রয়াত বংশী ঠাকুর প্রয়াত কুঞ্জ দেববর্মার বাড়ীতে আগরতলা শহরের উপজাতি যুবক ও প্রাক্তন সৈনিকদের এক জরুরী মিটিং আহ্বান করেছিলেন! তবে আগরতলা শহরের ঠাকুর পরিবারের যুবকরা ঐ মিটিং-এ খুব বেশী যোগদান করে নাই। আমি ব্যাক্তিগতভাবে ঐ মিটিং-এ উপস্থিত ছিলাম। তখনকার রাজনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা করেন প্রয়াত বংশীঠাকুর। অবস্থার মোকাবিলা করার প্রয়োজনে 'সেংক্রাক' নামে একটি ভলেণ্টিয়ার বাহিনী গঠন করার প্রস্তাব ঐ মিটিং-এ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল। প্রয়াত বংশী ঠাকুর এই সংগঠনের প্রধান ছিলেন দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের আগরতলা শহরের অধিকাংশ প্রাক্তন সৈনিকও এই সেংক্রাক বাহিনীতে যোগদান করেছিলেন। আমাদের বোর্ডিং-এর শ্রীহরিচরণ দেববর্মা সহ অনেক ছাত্ররাও .এই বাহিনীতে অন্তর্ভূক্ত ছিল। 'সেংক্রাক' বাহিনী গঠনের প্রয়োজনীয়তা ও লক্ষ্য সম্পর্কে একটি বিজ্ঞপ্তিও ছাপিয়ে প্রচার করা হয়েছিল। এই ছাপান বিজ্ঞপ্তিতে উদ্যোক্তাদের মধ্যে আমার নামও ছিল। ত্রিপুরাতে বিখ্যাত তথ্য সংগ্রাহক ও সংরক্ষক শ্রীমণিময় দেববর্মার নিকট এই বিজ্ঞপ্তি অতি সযত্নে রক্ষিত আছে

অপরদিকে মোঃ আব্দুল বারিক (গেদু মিঞা) এর নেতৃত্বে সংগঠিত আঞ্জুমান ইসলামিঞার কর্মকর্তাদের পাকিস্থানের নেতৃত্বের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ খুবই সক্রিয় ছিল। ত্রিপুরার উপজাতি জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক নেতৃত্ব পাকিস্থানের উগ্র মুসলিম সাম্প্রদায়িক নেতাদের সহিত এ রাজ্যের আঞ্জুমান ইসলামিয়ার নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও সক্রিয় তৎপরতার কারণই 'সেংক্রাক' বাহিনী গঠনের মূল কারণ ছিল। যে কোন উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলার প্রয়োজনে সেংক্রাক বাহিনী গঠিত হয়েছিল। প্রযাত বংশীঠাকুরের নেতৃত্বে গঠিত সেংক্রাক বাহিনী কোন রকম সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গঠিত হয় নাই। যদি কমঃ বীরেন দত্তের বক্তব্য মতো সেংক্রাক বাহিনী বাঙ্গাল খেদার উদ্দেশ্যে গঠিত হত তা'হলে কিছু না কিছু প্রতিফলনের নজীর থাকত। উদ্বাস্তু আগমনের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করা হত, বাঙ্গাল খেদা কিংবা উদ্বাস্তু আগমণের বিরুদ্ধে কোন রকম আন্দোলনের নজীর তুলে ধরা কমঃ বীরেন দত্তের পক্ষে সম্ভব হবে না।

পরবর্তী সময়ে প্রয়াত দুর্জয় কিশোর দেববর্মার নেতৃত্বে সেংক্রাক বাহিনী গঠন করার প্রচেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু জনসমর্থন ছিল না। ফলে নামেই সেংক্রাক বাহিনী ছিল, কার্যতঃ কিছুই ছিল না।

"বাঙ্গালী উদ্বাস্তুরা ত্রিপুরাকে গ্রাস করে ফেলেছে—সেংক্রাক বাহিনীর প্রচার"— ইত্যাদির বাস্তবতার সহিত কোন সঙ্গতি নেই। কমঃ বীরেন দত্তের মনে রাখা দরকার, বাঙ্গালী খেদার মানসিকতা নিয়ে যদি প্রয়াত বংশী ঠাকুরের নেতৃত্বে সেংক্রাক বাহিনী গঠিত হয়ে থাকত তা' হলে ত্রিপুরায় এত উদ্বাস্তুর অনুপ্রবেশ ঘটত কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ ছিল। রীতিমত রক্তগঙ্গা বয়ে যেত। তৎসময়ে ত্রিপুরার প্রশাসনিক শক্তি এত দুর্বল ছিল,—মোকাবিলা করার মত অবস্থাও তেমন ছিল না। তাছাড়া কমিউনিস্ট পার্টি'র দুই একজন নেতা ও মুষ্টিমেয় কিছু কর্মী ছিল। কোনরকম সাংগঠনিক শক্তি ছিল না।

প্রয়াত বংশীঠাকুরের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব ছিল বটে কিন্তু তিনি মোটেই সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। বরাবর গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন জাতীয়তাবাদী ছিলেন।

পুস্তিকার ৪৬ পৃষ্ঠায় কমঃ বীরেন দত্ত লিখেছেন, "১৯৩৯ সালের মে মাসে ত্রিপুরা রাজ্যের কথা পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয়েছিল, পত্রিকার প্রচার সংখ্যা অদ্ভুত-ভাবে বেড়ে গিয়েছিল। জনমঙ্গল সমিতির প্রতিটি কর্মী এই পত্রিকার পাঠক ও গ্রাহক হয়ে পড়েছিলেন" ইত্যাদি। অথচ 'ত্রিপুরা রাজ্যের কথা' পত্রিকা ১৩৫৭ ত্রীং সনে (১৯৪৭ সনে) প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

১৩৪৯ ত্রীং সনে (১৯৩৯ সনে) 'প্রজার কথা' নামক পত্রিকাটি প্রথমে বের করা হয়েছিল।

ত্রিপুরার কথা' বের হয়েছিল গত ১৯৫০ সনে। (মনিময় দেববর্মার সংরক্ষিত রেকর্ড থেকে সংগৃহীত) কাজেই কমঃ বীরেন দত্তের লিখিত উক্তিগুলির বাস্তবতাব সহিত কোন সঙ্গতি নেই।

পুস্তিকার ৪৬ পৃষ্ঠায় জনশিক্ষা প্রিণ্টিং প্রেস সম্পর্কে লিখেছেন কমঃ বীরেন দত্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হীরু দত্তের পুকুর পাড়ে হস্তচালিত ছাপাখানা স্থাপিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই প্রেস মেশিন কোথা থেকে পেয়েছেন ইহা বেমালুম চেপে গিয়েছেন। এই প্রেস প্রসঙ্গে কমঃ বীরেন দত্ত যখন উল্লেখ করেছেন ইহার বাস্তবতার ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছি। এই প্রেসের মূল মেশিনটি যখন ক্রয় করা হয়েছিল তখন কমঃ বীরেন দত্ত Preventive Detention Act-এ জেলে আটক ছিলেন। জনশিক্ষা প্রেসের পুরান মূল মেশিনটি গণমুক্তি পরিষদের সংগৃহীত ফাণ্ড থেকে আমার এক বন্ধু ভাগ্যলক্ষ্মী প্রেসের মালিকের নিকট থেকে অতি গোপনে ক্রয় করা হয়েছিল। আত্মগোপন করে থাকার সময় আমাদের রাজনৈতিক বক্তব্য জনসাধারনের কাছে উপস্থিত করার ব্যাপারে বা বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি ছাপানোর প্রয়োজনেই এই প্রেস

মেশিনটি ক্রয় করার সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল। ভাগ্যলক্ষী প্রেসের মালিক এখনও জীবিত আছেন।

তিনি বরাবরই আমাদের আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তখন আগরতলায় প্রেসের সংখ্যা খুবই কম ছিল। অতএব আমাদের বিজ্ঞাপনগুলি এখানে ছাপানোর দায়িত্ব নিতে কেহই রাজী ছিলেন না। অগত্যা অনেক বিপদের ঝুঁকি নিয়ে পূর্ব পাকিস্থান অধুনা বাংলাদেশে লোক পাঠিয়ে বিজ্ঞপ্তি ছাপানোর ব্যবস্থা করা হত। তাছাড়া দেশের খবরাখবর রাখার প্রয়োজনে আমাদের একটা রেডিওরও প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ড্রাই ব্যাটারী সেট্ তখনও বাজারে বের হয়নি। রেশম বাগানের উত্তর দিকে ময়রম নগরে একটি রোমান ক্যাথলিক খ্রীস্টান মিশনারীদের চার্চ ছিল। ফাদার ডাইম্যান নামে গারু সম্প্রদায়ের এক ধর্মযাজক ছিলেন। সেই ভদ্রলোকের একটি মটোর ব্যাটারী সেট্ রেডিও ছিল। প্রয়াত হেমন্ত দেববর্মার সহিত ফাদার ডাইম্যান এর খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল। রেডিও-র দাম ছিল ৫০০ টাকা। আমি, প্রয়াত হেমন্ত দেববর্মা, সুধন্ব্যা ও কমঃ দশরথ চারজনই জনপ্রতি ৫০০ পাঁচ শত টাকা সংগ্রহ করার জন্য কোটা নিয়েছিলাম এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যার যার ৫০০ টাকা সংগ্রহ করে দুর্গা চৌধুরী পাড়াতে একত্রিত হওয়ার কথা ছিল। যথা সময়ে আমি ও দশরথ জনপ্রতি ৫০০ টাকা সংগ্রহ করে দুর্গা চৌধুরী পাড়াতে উপস্থিত হয়েছিলাম। কমঃ সুধন্ব্যা ও প্রয়াত হেমন্তও উপস্থিত হয়েছিলেন বটে কিন্তু নির্ধারিত টাকার এক পয়সাও সংগ্রহ করতে পারেন নি। আমার সংগৃহীত ৫০০ টাকা দিয়ে ভাগ্যলক্ষী প্রেসের মূল মেশিনটি ক্রয় করার সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল। এবং কমঃ দশরথের সংগৃহীত ৫০০ টাকা দিয়ে ফাদার ডাইম্যানের পুরানো রেডিওটি ক্রয় করার সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল। কমঃ দশরথ রেডিও ক্রয় করার পরও টাকা সংগ্রহ করে একটি নতুন মোটর ব্যাটারী ক্রয় করেছিলেন। আমাকে ও প্রেসের টাইপ ও আনুসাঙ্গিক ইত্যাদি ক্রয় করার জন্য আরও টাকা সংগ্রহ করতে হয়েছিল। প্রয়াত হেমন্ত ও কমঃ সুধন্ব্যা এই প্রেস ও রেডিও ক্রয় করার ব্যাপারে কোন অবদান ছিল না। প্রেস ক্রয় করার ব্যাপারে কমঃ বীরেন দত্তের ভূমিকার প্রশ্নই উঠেনি।

কারণ তিনি তখন জেলে আটক ছিলেন, পরবর্তী সময়ে ত্রিপুরা পার্টি Open ground-এ আসার পর আগরতলাতে প্রেসটি নিয়ে আসা হয়েছিল।

এই মেশিনটিকে ভিত্তি করেই প্রথমে জনশিক্ষা প্রেস স্থাপন করা হয়েছিল। অবশ্য নূতন ট্রেড্রিল মেসিনও যোগাড় করা হয়েছিল। জনশিক্ষা প্রেস সম্পর্কে কমঃ বীরেন দত্ত যেভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তাতে ইহা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে তিনি প্রেসের ব্যাপারে সব কিছু করেছেন। কাজেই কমঃ বীরেন দত্তের পরিবেশিত বক্তব্যের সহিত বাস্তবতার কোন সঙ্গতি নাই।

পুস্তিকার ৪৮ পৃষ্ঠায় কমঃ বীরেন দত্ত আবার লিখেছেন,—"কমঃ বঙ্কিম চক্রবর্তী ও অঘোর দেববর্মা জনশিক্ষা ও প্রজামণ্ডলের বিকল্প হিসাবে স্বতন্ত্র

কৃষক সভা গঠনের প্রস্তাব ; জনশিক্ষা ও প্রজামণ্ডলের ভিতরে কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্নরা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করেই তারা সদর দক্ষিণের জম্পেজা নগরে এক জনসভা আহ্বান করেছিলেন”—ইত্যাদি।

কমরেড বীরেন দত্তের মনে রাখা দরকার ১৯৪৮ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসের সদর উত্তরে লেফুংগ্রা গ্রামে (অবশ্য কমঃ দশরথের মতে বাজঘাট) গণমুক্তি পরিষদ গঠিত হওয়ার পর প্রজামণ্ডলের কিংবা জনশিক্ষা সমিতির বিশেষ কোন ভূমিকা বা অস্তিত্ব থাকেনি। তখন গণমুক্তি পরিষদের নামেই সংগ্রামী উপজাতি যুবক ও জনতাদের সংগঠিত করা হত। এবং বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদিও আমার নামে, অথবা কমঃ দশরথ দেবের নামে গণমুক্তি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতি হিসেবে প্রচার করা হত। কাজেই পার্টির অধিকাংশ সদস্যের সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করে জনশিক্ষা ও প্রজামণ্ডলের বিকল্প হিসাবে কৃষক সমিতি গঠন করার প্রয়াসী হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। কমঃ বীরেন দত্ত তখন জেলে আটক ছিলেন। তিনি কাহার নিকট থেকে এই উদ্ভট তথ্যটি যোগাড় করেছেন জানি না। কমঃ বঙ্কিম চক্রবর্তী ও আমি পার্টির অধিকাংশ সদস্যের সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করে কোন পদক্ষেপ নেওয়ার কোন তথ্য ও ঘটনা কমঃ বীরেন দত্ত উপস্থিত করতে পারবেন না। তিনি অধিকাংশ পার্টি সদস্যের কথা উল্লেখ করেছেন কিন্তু অধিকাংশ পার্টি সদস্য কারা দুই একজনের নাম উল্লেখ করলে খুশী হতাম। কমঃ বীরেন দত্তের এই উক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, বিভ্রান্তিকর ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। সেহেতু আমি বর্তমানে সি পি. আই এবং কমঃ বীরেন দত্ত সি পি. এম অতএব আমাকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার হীন উদ্দেশ্য নিয়েই বাস্তব বর্জিত ও ভিত্তিহীন বক্তব্য উপস্থিত করার প্রয়াসী হয়েছেন। কমঃ বীরেন দত্তের মত প্রাচীন একজন কমিউনিস্ট নেতা যে এই ধরনের বিভ্রান্তিকর ও ভিত্তিহীন উক্তি করেছেন ইহা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। কমঃ বঙ্কিম চক্রবর্তী এখনও জীবিত আছেন। তিনি এখন দুর্গাপুরে আছেন। কমঃ বীরেন দত্ত জেলে আটক হওয়ার পর আগরতলা শহরের কমঃ আতিকুল ইসলাম, কমঃ বঙ্কিম চক্রবর্তী, কমঃ বেনু সেনগুপ্ত, কমঃ কানু সেনগুপ্ত, প্রয়াত গৌরাঙ্গ দেববর্মা, মণ্টু দাশগুপ্ত ও অন্যান্য কর্মীদের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। মণ্টু দাশগুপ্ত সহায়ক কর্মী হিসেবে বরাবর আমার সঙ্গে প্রাথমিক স্তরে ছিলেন। কোন নূতন সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রশ্ন উঠলে আমার অধ্যুষিত এলাকায় আহবান করে সমবেতভাবে ঐক্যমত হয়েই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম। আমাদের মধ্যে কোন বিষয় নিয়ে মতানৈক্য বা মতবিরোধ পর্যন্ত ছিল না। অথচ কমঃ বীরেন দত্ত আবিষ্কার করলেন আমি ও কমঃ বঙ্কিম চক্রবর্তী পার্টির অধিকাংশ সদস্যের সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করে কৃষক সমিতি নাকি করেছিলাম। কৃষক সমিতি প্রসঙ্গ আমি অন্য সময় আলোচনার চেষ্টা করব।

কমঃ বীরেন দত্ত পুস্তিকার ৪৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন “কমিউনিস্ট পার্টি জনশিক্ষা

সমিতির অন্তর্ভুক্ত গ্রামাঞ্চলের উপজাতি ও হিন্দু মুসলমান কৃষকদের মধ্যে যে কমিটিগুলি করেছিল কিছু সংখ্যক পার্টি কর্মী তাদের সহিত নিবিড় সম্পর্ক রেখে সংগ্রামের পথে দায়িত্বশীল শাসন আদায়ের জন্য ব্যপক জমায়েতের প্রস্তুতি নিয়েছিল। ১৯৪৮ সলের ১৫ই আগস্ট দিনটিকে দায়িত্বশীল শাসন প্রতিষ্ঠার দিন হিসেবে পালন করা হয়েছিল।"

কমঃ বীরেন দত্ত বক্তব্যগুলি খুব সাজিয়ে গুছিয়ে উপস্থিত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তিনি তখন জেলে আটক ছিলেন। প্রকৃত ঘটনার সহিত কমঃ বীরেন দত্তের কোন সম্পর্ক ছিল না। তাছাড়া কমঃ বীরেন দত্ত তখন আগরতলা জেলেও ছিলেন না।

গণমুক্তি পরিষদ গঠিত হওয়ার পর প্রজামণ্ডল কিংবা জনশিক্ষা সমিতির কোন বাস্তব ভূমিকা বা অস্তিত্বই ছিল না। ইহা আমি পূর্বেই আলোচনা করেছি। এবং কমঃ বীরেন দত্তেরও অজানা থাকার কথা নহে। তিনি কিছু সংখ্যক কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীর ভূমিকা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন কিন্তু তাদের নাম ভুলেও উল্লেখ করেন নি। তিনি নিজে এবং কমঃ দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত জেলে আটক ছিলেন। কমঃ সুধন্বা, কমঃ দশরথ এবং প্রয়াত হেমন্ত দেববর্মা তখন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করা দূরের কথা কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে ধ্যান ধারনাই অন্যরকম ছিল। বিশেষ করে প্রয়াত হেমন্ত দেববর্মা ও সুধন্বা দেববর্মার কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে বিরূপ মনোভাবই অত্যন্ত প্রবল ছিল। জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ উপজাতি শিক্ষিত যুবকদের নিয়ে গঠিত গণমুক্তি পরিষদ গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী দলই প্রথম স্তরে ছিল। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন কমঃ দশরথ গণমুক্তি পরিষদের সভাপতি হিসেবে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এর কাছে "আমরা কমিউনিস্ট নহি" এই কথা বলে চিঠির পর চিঠি দিয়েছেন। শুধু তাই নহে বহুবার গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে ও গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তনের দাবীসহ "আমরা কমিউনিস্ট নহি" এই কথা লিখে স্মারকলিপি পাঠিয়েছেন। যদি ঐ স্মারকলিপিগুলি দিল্লী মহাফেজখানায় সংরক্ষিত থাকে তাহলে অবশ্যই ঐ ঐতিহাসিক মূল্যবান তথ্যগুলি পাওয়া যাবে। আমি গণমুক্তি পরিষদের সাধারন সম্পাদক ও মুক্তি পরিষদের নেতৃত্ব ও কর্মীদের কাছে অপ্রকাশিত ত্রিপুর রাজ্যের কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক হিসেবে অত্যন্ত ধৈর্য ও সহনশীলতার সহিত কিভাবে মুক্তি পরিষদের আন্দোলনকে বাস্তব কর্মসূচীর মাধ্যমে সংগ্রামমুখী করে তুলেছিলাম ইহা কমঃ বীরেন দত্তের অজানা ছিল না। গণমুক্তি পরিষদ গঠিত হওয়ার প্রাথমিক স্তরে পরিষদের নেতৃত্ব ও কর্মীদের কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে আতংক ও বিরূপ মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে কমঃ বীরেন দত্তই আমাকে কমিউনিস্ট হিসেবে Exposed না হওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। Exposed হলেও মুক্তি পরিষদের সংগঠনের প্রাথমিক স্তরে অত্যন্ত ক্ষতিকর হত।

কমঃ বীরেন দত্ত তখনকার ঘটনাপ্রবাহের বাস্তবতা জেনেও ইচ্ছাকৃতভাবে চেপে গেলেন। তাঁর এবং দেবপ্রসাদ সেনগুপ্তের অবর্তমানে কে বা কাহারা পার্টির কর্মীদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কমঃ বীরেন দত্ত ইচ্ছাকৃতভাবেই চেপে গেলেন। তদুপরি ১৯৪৮ সনের ১৫ই আগস্ট গণমুক্তি পরিষদের দায়িত্বশীল সরকারের দাবীতে যে বিরাট ও অভূতপূর্ব মিছিল হয়েছিল তখন কমঃ বীরেন দত্ত জেলে আটক ছিলেন। তিনি ১৯৫৮ সনের ১৬ই আগস্ট ত্রিপুরা রাজ্যে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে "দাবী দিবস" পালনের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু গণমুক্তি পরিষদ বে-আইনী ঘোষিত অবস্থায় এবং গ্রেপ্তারী পরোয়ানা অগ্রাহ্য করে কে এই ঐতিহাসিক বিরাট শোভাযাত্রা পরিচালনা করেছিল—ইহা কমঃ বীরেন দত্ত ইচ্ছাকৃত-ভাবেই এড়িয়ে গিয়েছেন।

১৯৪৮ সনের ১৫ই আগস্ট এ রাজ্যের উপজাতি জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিকগত দাবী দাওয়ার প্রথম ঐতিহাসিক "দাবী দিবস" হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে, উদ্যোক্তা গণমুক্তি পরিষদ। গণমুক্তি পরিষদের সিদ্ধান্তমতো সদর দক্ষিণ, সদর উত্তর এবং খোয়াই বিভাগের উপজাতি জনগোষ্ঠী ১৪ই আগস্ট সন্ধ্যা থেকেই আগরতলা সংলগ্ন দুর্গাচৌধুরী পাড়াতে জমায়েত হতে আরম্ভ করেছিল। সাংগঠনিক প্রচার এত নিখুঁত ও সর্তকতার সহিত করা হয়েছিল তৎকালীন রাজ্য সরকার আগাম তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছিল কিনা জানি না তবে হঠাৎ করে শোভাযাত্রা বন্ধ করার মত অবস্থা ছিল না। এত হাজার হাজার মানুষের খাদ্য ও থাকার ব্যবস্থা করা রীতিমত কঠিন কাজ ছিল। কিন্তু অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে তা করা হয়েছিল। দুর্গাচৌধুরী পাড়া তখন একটি সমৃদ্ধ উপজাতি গ্রাম। দুর্গা চৌধুরী পাড়ার পূর্ব দিকে কালিনগর ও মহেশপুর পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় পূর্ব ও সদর দক্ষিণের জনসাধারণ জমায়েৎ হয়েছিল।

দুর্গা চৌধুরী পাড়ার উত্তর দিকে গামছা কবড়া, রাজঘাট, লেফুংগা ও কুমার বিল গ্রামগুলিতে সদর উত্তর খোয়াই বিভাগের জনসাধারণ পায়ে হেটে ১৪ই আগস্ট জমায়েৎ হয়েছিল। তখন দুর্গা চৌধুরীর উপজাতি কৃষকরা প্রচুর বেগুন ও ঢেড়স ইত্যাদি চাষ করতেন। ভাতের ও তরকারীর কোনরকম অভাব ছিল না। সব ব্যবস্থাই অত্যন্ত সুসংগঠিত ও নিখুঁত ছিল। মোটের উপর দুর্গা চৌধুরী পাড়াকে এ রাজ্যের উপজাতি জনতার রাজনৈতিক আন্দোলন বা গণজাগরণের একটি পীঠস্থান হিসেবে চিহ্নিত করা উচিত। আন্দোলনের জীবনে দুর্গা চৌধুরী পাড়ার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাদের অবদান প্রত্যেকটি উপজাতি জনতা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করা উচিত। তাদের অকৃত্রিম অবদান আগামী দিনে উপজাতিদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে চিরদিন প্রেরণা যোগাবে।

১৯৪৮ সনের ১৫ই আগস্ট সকালে গণমুক্তি পরিষদ নেতৃত্ব ও কর্মীদের মধ্যে মিছিল পরিচালনা ও মুক্তি পরিষদের রাজনৈতিক দাবী দাওয়ার লিখিত বক্তব্য এবং স্লোগানগুলি ঠিক করার জন্য দুর্গা চৌধুরী পাড়া স্কুল ঘরে মিটিং হচ্ছিল।

অপরদিকে আগরতলার উমাকান্ত ময়দানে ঐদিন সকাল থেকেই ত্রিপুরার রাজকীয় বাহিনী ফার্স্ট ত্রিপুরা রাইফেলস্-এর মহড়া উপলক্ষে রাইফেলস্ ও মেসিনগানের আওয়াজ দুর্গা চৌধুরী পাড়া থেকে পরিষ্কার শুনা যাচ্ছিল। তখন জনতার মধ্যে প্রথমে গুঞ্জন ও পরবর্তী সময়ে রীতিমত দাবী উঠতে থাকে কমঃ দশরথ ও সুধন্বার মধ্যে যে কেহ একজনের মিছিলে অবশ্যই যেতে হবে। সুধন্বা দেববর্মা সরাসরি মিছিলে যেতে অস্বীকার করায় জনতার মধ্যে বিক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে। কিন্তু কমঃ দশরথ অতি বুদ্ধিমান, তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ও সহনশীলতার সহিত অনেক যুক্তি দিয়ে মিছিলে না যাওয়ার কারণ সম্পর্কে বুঝাতে থাকেন। কিন্তু জনতাও নাছোড়বান্দা, কিছুতেই বাগ মানানো যাচ্ছিল না। জনতার মধ্যে বিক্ষোভ ক্রমশ বাড়তে থাকে। জনতার মধ্যে বলাবলি হতে থাকে "আমাদের বন্দুকের মুখে ঠেলে দিয়ে দুই নেতা নিবিড় আরামে তামাসা দেখবে, ইহা কিছুতে হতে দেওয়া উচিত নহে"—ইত্যাদি। তদুপরি আমার নাম প্রস্তাব করার সৎসাহসিকতাও তাদের দুইজনের ছিল না। আমার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছিল। কিন্তু জনতার অনমনীয় মনোভাব লক্ষ্য করে শেষ পর্যন্ত মিছিল পরিচালনা করার জন্য আমি আমার নাম স্বেচ্ছায় ঘোষণা করলাম। আমি ঐ সমবেত জনসাধারণকে লক্ষ্য করে বলেছিলাম,—"আমি সমস্ত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে মিছিলের পুরোভাগে থাকব এবং যে কোন অবস্থার জন্য প্রস্তুত আছি" বলে ঘোষণা করেছিলাম। তখন জনসাধারণ শান্ত হল এবং আগরতলায় মিছিলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। অবশ্য কমঃ দশরথ প্রয়াত হেমন্ত দেববর্মাকে অনেক বুঝিয়ে শেষ পর্যন্ত মিছিলে অংশ গ্রহণ করানোর জন্য রাজী করিয়েছিলেন।

যথাসময়ে আমি মিছিলের পুরোভাগে থেকে আগরতলা অভিমুখে রওনা হয়েছিলাম। বিশ্রামগঞ্জ কলোনীর প্রয়াত যতীন্দ্র দেববর্মা ও অন্য একজন গণমুক্তি পরিষদের ফেস্টুন নিয়ে মিছিলের অগ্রভাগে ছিলেন। সুতারমুড়া গ্রামের প্রয়াত রাজমোহন দেববর্মা অত্যন্ত সাহসের সহিত মিছিলের অগ্রভাগে ছিলেন। কিন্তু মিছিলে শ্লোগান দেওয়ার মত ছাত্ররা না থাকাতে খুব অসুবিধা হয়েছিল। ইহার আগে উপজাতি জনগোষ্ঠী কোনদিন এভাবে সুসংগঠিতভাবে মিছিল করি নাই। আমি মিছিলের ভিতরে এক মাথা থেকে আরেক মাথা দৌড়াদৌড়ি করে শ্লোগান দিয়েছিলাম। ইনক্লাব বলার পর জিন্দাবাদ বলাতে রীতিমত হিমসিম খেতে হয়েছিল। কারণ উপজাতি জনতা তখন জিন্দাবাদ বলতে পারত না, জিংগাবার বলত। অন্যান্য শ্লোগান এর মধ্যে দেওয়ান এ বি. চ্যাটার্জী দূর হউক; জোড়ালোভাবেই বলতে পারত। আমাদের মিছিল আশ্রম চৌমুহনী থেকে সোজা জেল এর সামনে দিয়ে ইটাখলা রোড হয়ে পূর্বের লাল দালান বর্তমানের টাউনহলের পাশ দিয়ে কালি বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে লক্ষ্মী নারায়ণ বাড়ির সামনের রাস্তা হয়ে সোজা দক্ষিণ দিকে জেক্শন গেইট পর্যন্ত

গিয়ে পশ্চিম দিকে আখাউড়া রাস্তার উপর দিয়ে উমাকান্ত মাঠে ঢুকে পড়েছিলাম। উমাকান্ত মাঠে দক্ষিণের শেষ সীমানা থেকে উত্তরে আখাউড়া রাস্তার রেলিং পর্যন্ত তিল ধারণের জায়গা ছিল না। আগরতলার জীবনে ইতিপূর্বে এত বড় বিরাট সমাবেশ আর কোনদিন হয়নি। উমাকান্ত বোর্ডিং থেকে টেবিল এনে টেবিলের উপরে উঠে আমি মুক্তি পরিষদের দাবী দাওয়ার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছিলাম।

সমাবেশের সভাপতি করা হয়েছিল তৎকালীন চড়িলাম স্কুলের হেডমাস্টার নমতাজ মিঞাকে। তিনিই গণমুক্তি পরিষদের লিখিত বক্তব্য পাঠ করেছিলেন। বক্তব্যটি কমঃ দশরথের লিখিত ছিল। আমি রিজেন্ট মাতা মহারাণীকে দিয়ে দেওয়ান এ. বি. চ্যাটার্জী ৩০০ বর্গ মাইল ট্রাইবেল রিজার্ভ ভাঙ্গার জন্য হুসিয়ারী দিয়েছিলাম। আমাদের মূল স্লোগান ছিল "ত্রিপুরায় দায়িত্বশীল সরকার প্রবর্তন কর"। কিন্তু এই স্লোগান উচ্চারণ করা উপজাতিদের পক্ষে অসুবিধা ছিল। তাই,—"প্রজার ভোটে মন্ত্রী চাই, দেওয়ান এ বি চ্যাটার্জী দূর হউক, পুলিশী নির্যাতন বন্ধ কর, গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহার কর ও ট্রাইবেল রিজার্ভ ভাঙ্গা চলবে না" ইত্যাদি। আমাদের ঐ ঐতিহাসিক সমাবেশে এ রাজ্যের মুসলমান, মণিপুরী ও হিন্দুস্থানী সম্প্রদায়ের লোকেরাও যথেষ্ট সংখ্যক অংশ গ্রহণ করেছিল।

প্রসঙ্গত এখানে বলা দরকার প্রয়াত হেমন্ত দেববর্মা মিটিং এর আশে পাশেও ছিলেন না। তিনি বীরেন্দ্র লাইব্রেরীর কাছে মিটিং-এর স্থান থেকে অনেক দূরে দর্শকের মত দাঁড়িয়েছিলেন। মিটিং চলার সময় তার কোন ভূমিকা ছিল না। মিটিং সমাপ্তির পর আমরা মাঠ থেকে অত্যন্ত সুসংবদ্ধভাবে আখাউড়া রাস্তায় উঠে সোজা পূর্বদিকে রওনা দিয়েছিলাম। তখন পুরানো পুলিশ রিজার্ভ থেকে একদল পুলিশ রাইফেল ও লম্বা লম্বা লাঠি কাঁধে আমাদের শোভাযাত্রার দিকে এগুতে থাকে। রাজকীয় বাহিনী ফার্স্ট ত্রিপুরা রাইফেলস্ ও রাস্তার দুইধারে নেমে গিয়েছিল। প্রথমে আমাকে ভি. এম হাসপাতাল চৌমুহনীতে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আমাদের মিছিলের ভিতর ঢোকার উপায় ছিল না। ইহার পর প্রয়াত সুরেন্দ্র কবিরাজের বাড়ীর সামনে আমাকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করা হয়েছিল। আবার পুরান আর. এম. এস চৌমুহনীতে অত্যন্ত মারমুখীভাবে আমাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু প্রতিবারই ব্যর্থ হয়েছিল। দুইজন জোয়ান দুইদিকে আমাকে কাঁধে করে নিয়ে গিয়েছিল। আর দুইদিকে জনতার প্রচণ্ড ব্যারিকেড। পুলিশ ও মিলিটারীরা অসহায়ের মত দাঁড়িয়েছিল। আমাকে গ্রেপ্তার করার জন্য রেশম বাগান পর্যন্ত ধাওয়া করেছিল। প্রয়াত হেমন্তকে গ্রেপ্তারের কোন রকম প্রচেষ্টা পুলিশ করেছিল বলে আমার মনে হয় না। অবশ্য পরবর্তী সময়ে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রয়াত হেমন্ত দেববর্মার নামে বের করা হয়েছিল। আমাকে যে দুইজন ব্যক্তি কাঁধে করে নিয়েছিলেন তাদের একজনকে এখনও আমার মনে আছে। তিনি হচ্ছেন খোয়াই বিভাগের

নলর‍ুং পাড়ার কান্ত দেববর্মা। আমাদের সেইদিনের বে-আইনী মিছিল অত্যন্ত সুসংগঠিত ছিল। এই বে-আইনী সংগঠিত অভূতপূর্ব ঐতিহাসিক বিক্ষোভ মিছিল সফলতার জন্য উপজাতি জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা ও আত্মবিশ্বাস উদ্ভূত হয়েছিল। এবং উপজাতি জনতার ব্যাপক অংশের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হবার প্রেরণা যুগিয়েছিল। কাজেই ইহার সুদূর প্রসারী তাৎপর্য খুবই অর্থবহ ছিল। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন ১৯৪৮ সনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হওয়ার পরে ত্রিপুরায় ও সর্বত্র ১৪৪ ধারা জারী করা ছিল। আমাকে জীবিত কিংবা মৃত ধরে দিতে পারলে একটা মোটা অংকের টাকা পুরস্কার দেওয়ার ঘোষনা রাজ্যসরকারের ছিল। আমার অনভিজ্ঞ রাজনৈতিক জীবনের প্রথম স্তরে যেভাবে ত্রিপুরায় গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করার Determination নিয়ে অত্যন্ত সাহসের সহিত বে-আইনী বিক্ষোভ মিছিল পরিচালনা করেছিলাম কমঃ বীরেন দত্তের আমার রাজনৈতিক গুরু হিসাবে গর্ব অনুভব করা উচিত ছিল। কমঃ বীরেন দত্ত আমার ঐতিহাসিক সাহসিকতার ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেওয়া দূরের কথা তিনি আমার নামটি পর্যন্ত উল্লেখ করেন নি। তিনি হযত আমার এই ভূমিকাকে রাজনৈতিক হটকারিতা বলে মনে করতে পারেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত এই বিরাট বিক্ষোভ মিছিল বে-আইনী অবস্থায় পরিচালনা করার মত নেতৃত্ব বা কর্মী ছিল না। রাজনৈতিক হটকারিতা বলে বিবেচিত হলেও আমাব পক্ষে এড়ানোর উপায় ছিল না। এখানে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন শহরের কমরেডদের মধ্যে একমাত্র কানু সেনগুপ্তই আমাদের মিছিলে সামিল হয়েছিলেন। পুস্তিকার ৪৮ পৃষ্ঠার শেষ প্যারাগ্রাফে কমঃ বীরেন দত্ত ১৯৪৮ সনের ৯ই অক্টোবর গোলাঘাটির উজানে ভক্তঠাকুরঘাটে তৎকালীন বিশালগড় থানার ও. সি মিহির দারোগার নেতৃত্বে নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর নির্বিচারে গুলি চালিয়ে যে বর্বর হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছিল ইহার আলোচনা করতে গিয়ে আমার উপর আক্রমনাত্মক মনোভাব নিয়ে যেভাবে সমালোচনা করেছেন কমঃ বীরেন দত্তের মত প্রবীন রাজনৈতিক নেতার পক্ষে তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে কোনরকম পর্যালোচনা বা মূল্যায়ন না করে আমার হটকারিতার ঝোঁক ইত্যাদি মন্তব্য করা সঙ্গত হয়েছে কিনা? গোলাঘাটির হত্যাকাণ্ডের ঘটনা প্রবাহের বাস্তবতা সম্পর্কে কমঃ বীরেন দত্তের কোন রকম ধ্যান ধারণা ছিল না। তিনি গোলাঘাটির হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন "গণমুক্তি পরিষদকে আত্মরক্ষামূলক প্রস্তুতি শুরু করার সময় না দিয়েই এককভাবে গোলাঘাটির মত ঘটনা সৃষ্টি করে ফেলেছিলেন"—ইত্যাদি পুস্তিকার ৫৬ পৃষ্ঠার প্রথম প্যারাগ্রাফে উল্লেখিত আছে।

কমঃ বীরেন দত্ত গোলাঘাটির হত্যাকাণ্ডকে রাজনৈতিকগত বিচার বিশ্লেষন করার চেষ্টাও করেন নি। তিনি এই হত্যাকাণ্ডের সমস্ত দায় দায়িত্ব আমার

ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে আমাকে জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টাই করেছেন। কিন্তু গোলাঘাটির হত্যাকাণ্ডের পরে ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম যে দ্রুত নূতন চেতনায় মোড় নিয়েছিল ইহার সুদূর প্রসারী তাৎপর্য কমঃ বীরেন দত্তের মত রাজনৈতিক নেতার চিন্তা চেতনার জগতে স্থান পায়নি। একদিন কথা প্রসঙ্গে প্রয়াত বংশীঠাকুর মন্তব্য করেছিলেন—"গোলাঘাটির হত্যাকাণ্ড ত্রিপুরা রাজ্যের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে দশ বৎসর এগিয়ে দিয়েছে"। প্রয়াত বংশীঠাকুরের এই মন্তব্যকে কোন রাজনৈতিক নেতার পক্ষেই অস্বীকার করার কোন কারন নেই।

আবহমানকাল ধরে সামন্ততান্ত্রিক শাসিত ত্রিপুরার পার্বত্য উপজাতি জন-গোষ্ঠীর সামন্ত রাজাদের প্রতি যে কত গভীর মোহ ছিল ইহাও কমঃ বীরেন দত্তের চিন্তা চেতনার জগতে স্থান পায়নি। গণমুক্তি পরিষদের সংগঠনের প্রাথমিক স্তরে রাজভক্ত বিভিন্ন এলাকার প্রভাবশালী সর্দারদের কিভাবে মোকাবিলা করতে হয়েছিল ইহা কমঃ বীরেন দত্তের জেলে আটক থেকে উপলব্ধি করার কথাও নহে। অপর-দিকে গণমুক্তি পরিষদের প্রভাবশালী নেতৃত্বের একটি অংশ কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে রীতিমত ভীত সন্ত্রস্ত—বারবার "আমরা কমিউনিস্ট নহি"—বলে তৎকালীন রিজেণ্ট মাতা মহারাণীর নিকট দরখাস্তের পর দরখাস্ত পাঠাচ্ছিল—এই সমস্ত ঘটনা প্রবাহ কমঃ বীরেন দত্তের জানার কথাও ছিল না, তিনি জানার চেষ্টাও করেন নি। তদুপরি ১৯৪৮ সনে কলিকাতায় পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তসমূহ ও প্রোগ্রাম কি ছিল ইহা কমঃ বীরেন দত্তের অজ্ঞাত ছিল না। পার্টি কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলি কার্যকরী করার দায়িত্ব এড়ানোর জন্যই কমঃ বীরেন দত্ত বুদ্ধিমানের মত স্বেচ্ছায় কারাবরন করেছিলেন।

গোলাঘাটির হত্যাকাণ্ডের পটভূমিকা, তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি, পার্টির সংগঠন ও গনমুক্তি পরিষদের নেতৃত্বের বড় অংশের চিন্তা চেতনা ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন বা বিচার বিশ্লেষণ করার মানসিকতা কমঃ বীরেন দত্তের ছিল না। তিনি যদি তখনকার বাস্তব অবস্থাগুলি ভাল করে খোঁজ খবর নিয়ে আমাকে সমালোচনা করতেন ইহাতে আমি খুশীই হতাম। কমঃ বীরেন দত্ত আমাকে হটকারী বলে মন্তব্য করেছেন কিন্তু তখনকার পার্টির রাজনৈতিক লাইন কি ছিল তা তিনি উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি। তৎকালীন পার্টির সন্ত্রাসবাদী ও হটকারী লাইন যদি আমাকে প্রভাবিত করে থাকে তাহলে আমি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হতে যাব কেন? এতগুলি নীরিহ ব্যক্তির অকাল মৃত্যুর জন্য কমঃ বীরেন দত্ত আমাকেই দায়ী করেছেন। কমঃ বীরেন দত্তের মত প্রবীন রাজনৈতিক নেতার পক্ষে এই ধরনের মন্তব্য খুবই দুর্ভাগ্যজনক।

গোলঘাটির হত্যাকাণ্ডের পর উপজাতি জনতার মধ্যে রাজাদের প্রতি যে গভীর আনুগত্য ও মোহ ছিল তা কাটিয়ে উঠে এ রাজ্যের গণতান্ত্রিক অধিকার

প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে উপজাতি জনগোষ্ঠীকে ব্যাপকভাবে ঐক্যবদ্ধ করতে সাহায্য করেছিল। ইহারও কমঃ বীরেন দত্তের পুস্তিকাতে স্বীকৃতি পর্যন্ত নাই।

গোলাঘাটি হত্যাকাণ্ডের পটভূমিকা

গোলাঘাটিতে পুলিশ ও মিলিটারীর বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের ঐতিহাসিক পটভূমিকা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

এ রাজ্যের তৎকালীন বহিরাগত কিংবা জিরাতিয়া প্রজারা ত্রিপুরার বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য বাজারগুলিতে আস্তানা করে নানা ধবনের ব্যবসা বাণিজ্য কবতেন। ত্রিপুরার সামন্ততান্ত্রিক শাসনের আমলে রাজ্যের অভ্যন্তরে কোনরকম যোগা-যোগের রাস্তা ছিল না। কাজেই এ রাজ্যের সামগ্রিক কৃষিজাত দ্রব্যাদি ও নিত্য ব্যবহার্য জিনিস পত্রাদি নদী পথেই নৌকা দিয়েই আমদানী ও রপ্তানি হত। নদীগুলিকে কেন্দ্র করেই এ রাজ্যের বড় বড় বাণিজ্যকেন্দ্রিক বাজাবগুলি গড়ে উঠেছিল। সদর দক্ষিণের বিজয় নদীর তীরে বিশালগড় বাজার ত্রিপুরার দীর্ঘ-দিনের পুরান ও বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্রিক বাজার। বিশালগড় বাজারের ব্যবসায়ীরা বিশেষ করে সাহা মহাজনদের অধিকাংশরেই বাড়ী ছিল অধুনা বাংলাদেশ বা তৎকালীন বৃটিশ শাসনাধীন ত্রিপুরা জেলার মন্দভাগ বা আষ্টজঙ্গল ইত্যাদি গ্রামে ছিল। বহুদিন পূর্বে বিশালগড় বাজারে সদর দক্ষিণের বিভাগীয় শহরের মর্যাদা ছিল, কারন সেখানে বিভাগীয় হাকিমেব বিচারালয় ও থানা ছিল। বাজারের আশে পাশে গ্রামে প্রধানত মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা বসবাস করতেন। ব্যবসায়ী সাহা সম্প্রদায় বাজারেই সীমাবদ্ধ ছিল তাও আবার জিরাতিয়া প্রজা ছিলেন। বিশালগড় বাজারকে কেন্দ্র করেই ব্যবসায়ী সাহা সম্প্রদায় গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা বাণিজ্য করতেন। এমন বহু ঘটনা আছে কেহ কেহ নিঃস্ব অবস্থায় এসে কোন বড় ব্যবসায়ীর দোকানে গোমস্তা বা কর্মচারী থেকে অথবা মহাজনের ঘর থেকে বাকীতে জিনিসপত্রাদি নিয়ে মাথায় করে উপজাতীয় গ্রামগুলিতে ফেরী করতেন। এবং পরবর্তী সময়ে রাতারাতি বিরাট ধনী ব্যবসায়ী হয়ে উঠেছিলেন। রাতারাতি ধনী হওয়ার সহজ পন্থা ছিল অতি সস্তা দরে কৃষকদের উৎপাদিত তিল, কার্পাস, সরিষা, পাট ও ধান ইত্যাদি আগাম টাকা দিয়ে ক্রয় করা। ইহার নামই হচ্ছে "দাদন"। এ রাজ্যের উপজাতিরা বরাবরই সরল। দাদন দেওয়ার সময় মহাজনেরা কোন রকম কার্পন্য করত না। অকাতরে এলাকার মধ্যে বিভিন্ন কৃষিজাত পন্যের দাদনের টাকা বিলি করত। উপজাতি প্রভাবশালী সর্দারদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করা, সকলকেই মামা, দাদা, বয়স্কদের জ্যাঠা ইত্যাদি ডেকে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতেন। আদায় করার সময়ও বাড়ীর বয়স্কদের মদ্যপান করানোর জন্য যথেচ্ছ টাকা খরচ করতেন। বাড়ীর মালিককেও বলতে দেখা গিয়েছে, "মহাজন তুমি নিজে ইচ্ছামত যা পাওনা মেপে নিয়ে যাও" ইত্যাদি। মদ খেতে পেয়ে বাড়ীর মালিক খুব খুশী। তখন

বর্দ্ধমান মহাজনেরা খুশী হয়ে বাড়ীর মালিককে আরও মদ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতেন। তখন মহাজন খুব ভাল মানুষ। মহাজনেরা তাদের প্রাপ্য ফসলের অতিরিক্ত মেপে অনায়াসে নিয়ে যেত।

এইভাবে ব্যবসায়ী মহাজনেরা উপজাতিদের সরলতা ও অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে নির্মমভাবে শোষণ চালাতেন। ব্যবসায়ী মহাজনদের দাদন-এর মারফত শোষণ এ রাজ্যের সামন্ত রাজাদের অজ্ঞাত ছিল না। রাজন্যবর্গদের বিশেষ কোন উপলক্ষের সময় ধনী ব্যবসায়ীরা রাজাদের নজরানা ইত্যাদি দেওয়ার ব্যবস্থাও ছিল।

এই সমস্ত কারনে দাদন প্রথা বন্ধ করার জন্য তেমন কোন ব্যবস্থাও গ্রহণ করতেন না। ত্রিপুরাতে এমন বহু ঘটনা আছে, একসের লবন কিংবা তামাক খাওয়ার কলিক বাকী দিয়ে সুদের সুদ, জের সুদ ও চক্রবৃদ্ধি সুদ ইত্যাদি করে উপজাতিদের আবাদি জমি দ্রোনের পর দ্রোন আদায় করে নিয়েছে। অবশ্য ত্রিপুরায় তখন প্রচুর অনাবাদি, খাস পতিত জমির অভাব ছিল না। উপজাতিদের চিন্তা চেতনার অনগ্রসরতার জন্য জমির প্রতি আকর্ষণ বা মমত্ববোধ অধিকাংশেরই ছিল না। এইভাবে বিশালগড় বাজারের সাহা মহাজনেরা, টাকারজলা, জম্পুইজলা এলাকার বিভিন্ন গ্রামে বহু জমির মালিক হয়ে উঠেছিলেন। বৃটিশ শাসিত পূর্ব-বাংলার মন্দভাগ গ্রামের মূল অধিবাসী ও ত্রিপুরার জিরাতিয়া প্রজা প্রয়াত হরিচরণ সাহাও বিশালগড় বাজারের সাহা সম্প্রদায়ের এক ধনী ব্যবসায়ী দাদনদার ছিল। ব্যবসায়ী দাদনদাররা শীতকালেই ক্ষেতের ধান উপজাতি কৃষকদের ধান উঠার সঙ্গে সঙ্গেই দাদনের ধান সংগ্রহ করে গ্রামের কোন প্রভাবশালী সর্দারের গুদামে কিংবা নিজস্ব গুদামে মজুত করে রাখতেন। শীতকালে নদীর জল কম থাকাতে নৌকা বোঝাই করে ধান নামানো অসুবিধা ছিল। আবার বর্ষাকালে নদীতে অতিমাত্রায় জল থাকার কারনে নৌকা বোঝাই করে ধান নামানোতে অসুবিধা ছিল। তাই আশ্বিন-কার্তিক মাসে নদীর জল সাধারণতঃ স্থিতিশীল থাকার সময় নৌকা বোঝাই ধান নামানো নিরাপদ ছিল। জম্পুইজলা বাজারে হরিচরণ সাহার নিজস্ব একটি গুদাম ঘরও ছিল। জম্পুই এলাকার সংগৃহীত দাদনের ধান প্রচুর সেই গুদামে মজুত ছিল। জম্পুইজলা ও টাকারজলাতে প্রচুর ধানের ফলন হত। গোলাঘাটি ও বিশ্রামগঞ্জ এলাকায় ধানের অকাল দেখা দিলেও জম্পুই ও টাকারজলাতে তা দেখা দিত না। কারন বিজয় নদীর (বুড়িমা) অববাহিকাতে কৃষিজাত দ্রব্যের ফলনও অন্যরকম হত। তবে কোন কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা খরা ইত্যাদির কারনে এলাকায় অন্নাভাব দেখা দিলে গ্রামের প্রভাবশালী সর্দার বা অবস্থাপন্ন কষকদের জিম্বায় রেখে অতি উচ্চ-মূল্যে অভাবী জনতার মধ্যে ধান বিলি করা হত। পরবর্তী বৎসরে ধান উঠামাত্র জিম্বাদার সর্দারেরা ধান সংগ্রহ করে মহাজনকে পরিশোধ করে দিত। ইহাই পার্বত্য এলাকার সাধারণ নিয়ম।

বিশালগড় বাজারের হরিচরন সাহার দাদন ও ক্রয়ের মজুত ধানই বরাবর সর্বাধিক ছিল।

অর্থনৈতিক সংকট

ভারত স্বাধীনতা পাওয়ার পর দেশ বিভাগ জনিত কারনে ত্রিপুরা রাজ্য প্রায় তিন দিকে তৎকালীন পাকিস্তান পরিবেষ্টিত হয়ে গিয়েছিল। ত্রিপুরা রাজ্য আবহমানকাল ধরে পূর্ব বাংলার সহিত কৃষিজাত দ্রব্যের ও বনজসম্পদ রপ্তানী ও নিত্যব্যবহার্য ভোগ্য পন্য আমদানী ইত্যাদির ব্যবসাবাণিজ্য ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত ছিল। পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্য অর্থনৈতিকগতভাবে সম্পূর্ণ পূর্ব বাংলার উপর নির্ভরশীল ছিল। ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব উপজাতি জনতার বিরাট অংশ বাঁশ, ছন ও কাঠ জাতীয় বনজ সম্পদ বিক্রী করে জীবিকা নির্বাহ করত। কিন্তু পূর্ব বাংলা অধুনা বাংলাদেশ পাকিস্তান হয়ে যাওয়াতে পূর্বের মত অবাধ ব্যবসা বাণিজ্য বা আমদানী ও রপ্তানী বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবে চোরা কারবার মারফত আমদানী ও রপ্তানী অব্যাহত ছিল। তাতে চোরাই পথে আমদানীকৃত ভোগ্যপন্য ইত্যাদির দাম অতিমাত্রায় বেড়ে গিয়েছিল। আসাম প্রদেশের সহিত ত্রিপুরার স্থলপথে কোনরকম যোগাযোগ ছিল না। ভারতের অন্যান্য অংশের সহিত একমাত্র আকাশপথেই যোগাযোগ বা আমদানী ও রপ্তানী ছিল। ইহাও অত্যন্ত সীমিত ছিল। তদুপরি গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী বৎসরগুলি অনবরত কলেরা বা বসন্ত পার্বত্য গ্রামাঞ্চলগুলিতে রীতিমত স্থায়িত্ব-লাভ করেছিল। ইহা ছাড়াও গোলাঘাটির হত্যাকাণ্ডের পূর্বের বৎসরগুলিতে বিশ্রামগঞ্জ এলাকাগুলিতে উপর্যোপরী গো ও মহিষের মরক ব্যাপক আকরে দেখা দিয়েছিল। তাতেও এলাকার অনেক কর্ষনযোগ্য জমি পতিত পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। এই সমস্ত কারনে বিশেষ করে গোলাঘাটি ও বিশ্রামগঞ্জ এলাকায় দারুণ অর্থনৈতিক সংকট ও অন্নাভাব দেখা দিয়েছিল।

ত্রিপুরার রিজেণ্টমাতা মহারাণী প্রয়াত কাঞ্চনপ্রভা দেবীর সরকারের রীতিমত অস্থিতিশীল অবস্থা। কোনরকমে ভারতের কংগ্রেস পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ত্রিপুরা রাজ্যের দায়িত্বভার ছেড়ে দিতে পারলেই তিনি বেঁচে যান। রাজ্যের সামগ্রিক অর্থনৈতিক সংকটের মোকাবিলা করার কোনরকম প্রোগ্রাম বা মানষিকতা রাজ্যের বড় আমলা বা রিজেণ্টমাতা মহারাণীর ছিল না।

একদিকে এলাকায় দারুণ অর্থনৈতিক সংকট ও অন্নাভাব। অপরদিকে রাজ্যের ত্রিপুরী উপজাতি জনগোষ্ঠী মুক্তি পরিষদের নেতৃত্বে রাজ্যে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। তদুপরি ১৯৪৮ সনের ১৬ই আগস্ট আগরতলার বুকে বিরাট বে-আইনী শোভাযাত্রা এবং আমার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ও মৃত কিংবা জীবিত ধরে দিতে পারলে পুরস্কার ঘোষনা থাকা সত্বেও মিছিলের সংগ্রামী মারমুখী ভূমিকার জন্য আমাকে ঐ

দিন রাজ্যের পুলিশ ও মিলিটারীরা অনেক চেষ্টা করেও আটক করতে পারেনি। ঐ ঘটনার পর স্বাভাবিকভাবেই ত্রিপুরী জনগোষ্ঠীর সংগ্রামী জনতার সাহস ও আত্মপ্রত্যয় অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গিয়েছিল। গোলাঘাটি বাজারের উজানে ভক্তঠাকুরঘাটে গ্রামের বুভুক্ষু ও নীরিহ গ্রামবাসীদের উপর নির্বিচারে তৎকালীন বিশালগড় থানার ও. সি মিহির দারোগার নেতৃত্বে গুলি চালনা ও হত্যাকাণ্ডের প্রায় তিনদিন আগে গোলাঘাটি বাজারের পশ্চিমদিকে সিপাইজলা ঘাটে বিশালগড়ের অন্যতম দাদনদার প্রয়াত তারিনী সাহা ও অন্য একজনের ৭টি নৌকা বোঝাই ধান স্থানীয় এলাকায় ত্রিপুরী ও মুসলমান কৃষকরা জোর করে নিজেদের মধ্যে বিলি বণ্টন করে নিয়ে গিয়েছিল। ঐ ঘটনায় বিশালগড় থানার পুলিশ ও গোলাঘাটি বাজারের ক্যাম্পের মিলিটারিরা নাকি দর্শকের ভূমিকা গ্রহন করেছিলেন। কারন সিপাইজলা ঘাটের নৌকার ধানও নাকি গোলাঘাটি ক্যাম্পের মিলিটারীরা আটক করে স্থানীয় জনসাধারণকে ধান নিয়ে যাওয়ার জন্য খবর দিয়েছিল। এই খবর সমগ্র এলাকার মধ্যে ঝড়ের বেগে ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে গ্রামের সর্দারেরা জিম্বা থেকে নৌকার ধান বিলিবণ্টন করেছিল বলে জানা গিয়েছিল। পরের বৎসর সুদ সহ আদায় করে মহাজনদের সম্যক ধান ফেরৎ দেওয়ার কথা ছিল। বিশালগড় বাজারের তারিণী সাহা অত্যন্ত বিবেচক ছিলেন। তিনি পুলিশী ব্যবস্থা নিয়ে কোনরকম গোলমাল করার চেষ্টাও করেন নি। তদুপরি প্রয়াত তারিণী সাহার গোলাঘাটি ও খানিয়ামারা গ্রামে বহু ধানী জমি ছিল। এই সমস্ত কারনেই হয়ত তিনি উপজাতি কৃষকদের বিরুদ্ধে শক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে উৎসাহিত ছিলেন না। অপরদিকে উজান থেকে ধান নামানোর কোনরকম পারমিটও ছিল না, বিনা পারমিটে উজান থেকে ধান নামানোর কারনেই গোলাঘাটি ক্যাম্পের মিলিটারীরা ধান আটক করে স্থানীয় জনসাধারণকে নৌকার ধান বিলি বণ্টনের জন্য খবর দিয়েছিল। স্মরণ থাকা প্রয়োজন সিপাইজলা ঘাটের নৌকার ধান বিলি বণ্টনের প্রাথমিক উদ্যোগ জনসাধারণ গ্রহন করে নাই।

অতঃপর জম্পুইজলা এলাকা থেকে আগত বিশালগড় বাজারের কুখ্যাত প্রয়াত হরিচরণ সাহার ২৩টি বোঝাই নৌকার ধান বিনা পারমিটে নামানো হচ্ছিল। গোলাঘাটি ক্যাম্পের মিলিটারীরা ভক্তঠাকুরঘাটে নৌকাগুলি আটক করে। তৎকালীন বিশালগড় থানার ও. সি মিহির চৌধুরীর মদ খাওয়ার আড্ডা ছিল গোলাঘাটি বাজার সংলগ্ন পুনীরাম ঠাকুর পাড়ার প্রয়াত দলপতির বাড়ীতে। গত কয়েকমাস আগে ১৯৮৫ সনের এপ্রিল মাসে তিনি মারা যান। প্রয়াত বীরবিক্রম মানিক্য বাহাদুর গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রাজ্যের আভ্যন্তরীন শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে ত্রিপুর সক্রিয় মণ্ডল কমিটির লোকদের নিয়ে "রাজ্য রক্ষী" বাহিনী গঠন করেছিলেন।

প্রত্যেকটি মণ্ডল কমিটির রাজ্য রক্ষী বাহিনীর পরিচালকদের "দলপতি"

উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। রোহী সর্দার গোলাঘাটি মণ্ডল কমিটির দলপতি। প্রয়াত সুধী সর্দার লাটিয়াছড়া মণ্ডল কমিটির সম্পাদক ছিলেন।

উভয়েই পুলিশ পুঙ্গব মিহির দারোগার মদের সাকরেদ ছিলেন। রোহী সর্দার খুব চালাক চতুর ছিলেন না। তবে সুধী সর্দার অত্যন্ত ধুরন্ধর ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বরাবর রাজতন্ত্রের একান্ত ভক্ত ছিলেন। গণমুক্তি পরিষদের নেতৃত্বে এ রাজ্যে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে তিনি বরাবর বিরোধিতা করেই আসছিলেন।

পরম্পর জানা যায় ভক্তঠাকুরের ঘাটে হত্যাকাণ্ডের একদিন আগে ১৯৪৮ সনের ৮ই অক্টোবর সকালবেলায় মিহির দারোগা গোলাঘাটি ক্যাম্পের এক মিলিটারীকে দিয়ে রোহি দলপতির কাছে একটি চিঠি পাঠিয়ে দেন। চিঠিতে নাকি লেখা ছিল,—"প্রিয় রোহি সর্দার, ভক্তঠাকুর ঘাটে বিশালগড় বাজারের হরি সাহার পারমিট বিহীন নৌকার ধান আটক করা হয়েছে। আপনি এলাকার সর্দার কিংবা মাতবর ব্যক্তিদের জামিন রেখে আটক ধান বিলির ব্যবস্থা করিবেন। ইতি ভবদীয় মিহির চৌধুরী, বিশালগড় থানার ও. সি".।

এই চিঠি পেয়েই নাকি রোহী দলপতি ও সুধী সর্দার ও রাধাকৃষ্ণ দেববর্মা সুধী সর্দারের বড় ভাই বিশ্রামগঞ্জ এলাকায় প্রায় সর্বত্র খবরাখবর দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। খবরটি ঝড়ের বেগে উদয়পুর বিভাগের বাগমা পর্যন্ত রাতারাতি ছড়িয়ে পড়ে। পরের দিন ৯ই অক্টোবর ১৯৪৮ সন বিশ্রামগঞ্জ এলাকার বুভুক্ষু জনসাধারণ যার যার গ্রামের জামিনদার নিয়ে বিভিন্ন ফাঁড়ি পথ দিয়ে ভক্তঠাকুরঘাটের দিকে রওনা হচ্ছিল।

আমার ব্যক্তিগত ভূমিকা

আমি সিপাইজলার ঘটনার কথা খবর পেয়ে ঐ দিন ভক্তঠাকুর ঘাটে ঘটনার দিন উজান থেকে ঘানিয়ামারা হীরাপুর হয়ে লাটিয়াছড়ার পথে ঝড়ের বেগে রওনা হয়েছিলাম। লাটিয়াছড়া যাওয়ার পথে বিভিন্ন ফাঁড়ি রাস্তায় কাতারে কাতারে বুভুক্ষু জনসাধারণকে ভক্তঠাকুর ঘাটের দিকে যেতে দেখেছিলাম। মাঝে মধ্যে তাদের আটকিয়ে মূল বিষয়বস্তু জানবার চেষ্টা করেছিলাম, মিহির দারোগার চিঠির কথা সবাই আমাকে বলেছিল। চিঠির কথা শুনা মাত্রই ইহা সে ষড়যন্ত্রমূলক এই কথা আমার ধারনা হয়েছিল, এবং পথে ঘাটে জনসাধারণকে বাধা দেওয়ার চেষ্টাও করেছিলাম, কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা, সকলের একই কথা, মিহির দারোগা রোহী দলপতিকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে। সেই চিঠির নির্দেশমত গ্রামের অবস্থাপন্ন কৃষক কিংবা সর্দারদের জামিন রেখে ধান আনবে, অতএব বাড়ীতে ফিরে যাওয়ার প্রশ্নই উঠেনা—ইত্যাদি। পথে চিকন ছড়ার প্রভাবশালী কুসুম সর্দারের সহিত আমার কথাবার্তা হয়েছিল। তিনি ধান আনার জন্য ঘোড়া নিয়ে যাচ্ছিলেন। সঙ্গে রীতিমত মিছিল। আমি সর্দারকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু কুসুম সর্দারের বদ্ধমূল ধারনা ছিল রাজার সিপাহীরা

কোন অবস্থাতেই উপজাতি জনতার উপর বিশেষ করে ত্রিপুরীদের গুলি করতে পারে না। তিনি বলেছিলেন, "ত্রিপুরার ইতিহাসে এমন কোন নজীরও নেই"। গ্রামের জনসাধারণকে তখন পর্যন্ত আমরা সর্দারদের প্রভাব থেকে মুক্ত করতে পারি নাই। ১৯৪৮ সনের ১৫ই আগস্ট এর বিরাট মিছিলের পর সর্বত্র আন্দোলনের জোয়ার বা ঢেউ উঠেছিল। ইহার সুযোগ নিয়ে গ্রামে গ্রামে কমিটি গঠন করে সংগঠিত রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা চালান হচ্ছিল। এখানে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন আমিও তৎক্ষণাৎ কমঃ সুধন্যার কাছে জরুরী চিঠি পাঠিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতি আলোচনার জন্য আসতে লিখেছিলাম। তিনি আসেন নি। শুধু ভক্তঠাকুর ঘাটে লোক যাওয়া বন্ধ করার জন্য চিঠি লিখেছিলেন, কিন্তু তখন সময় অতিক্রান্ত, তদুপরি লোক যাওয়া বন্ধ করার মত অবস্থাও ছিল না।

এলাকায় ঢুকেই মিহির দারোগার চিঠির কথা শুনেছিলাম এবং গোলাঘাটি এলাকার নির্ভরযোগ্য কর্মী হিসাবে প্রয়াত মাগ্রাই দেববর্মা ও রাজচন্দ্র সর্দার এবং পেকুয়া জলার বিনোদ দেববর্মাকে জরুরী লোক মারফত ডাকিয়ে এনেছিলাম। তখন বেলা প্রায় ৯টা বেজে গিয়েছিল। আমার নিজগ্রামে পৌঁছবার পূর্বেই অধিকাংশ গ্রামের লোক ভক্তঠাকুর ঘাটে চলে গিয়েছিল। আমি মাগ্রাই দেববর্মা ও রাজচন্দ্র সর্দারের কাছ থেকে মিলিটারী ও পুলিশের প্রস্তুতি পর্ব সম্যক অবগত হয়েছিলাম। ভক্তঠাকুর ঘাটে যেখানে ধান বোঝাই নৌকাগুলি ছিল চতুর্দিকে বেড়া দেওয়ায় একটি মাত্র সরুগলি পথ করে রাখা এবং গুলি চালানোর পর মৃত ব্যক্তিদের দেহ বহন করার জন্য বাঁশের বেত দিয়ে স্ট্রেচার তৈয়ারী করানো ইত্যাদি সবই অবগত হয়েছিলাম। কিন্তু অতি দুর্ভাগ্য আমি এলাকায় ঢুকবার পূর্বেই অধিকাংশ জনতা ভক্তঠাকুর ঘাটে জমায়েৎ হয়েছিলেন।

সিপাইজলা ঘাটে ৭টি নৌকার ধান বিলির সময় পুলিশ ও মিলিটারীরা উপস্থিত ছিল, এবং কিছুই করে নাই। ঘটনার আগের দিন যদি এলাকায় পৌঁছানো যেত তবে সুসংগঠিতভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা যেত। যখন এলাকায় ঢুকেছিলাম তখন সময় রীতিমত অতিক্রান্ত। ইহার পেছনে যে গভীর ষড়যন্ত্র ছিল এই সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিলাম। তাই অবস্থা আয়ত্ত্বে আনার জন্য পেকুয়াজলার বিনোদ দেববর্মার নেতৃত্বে গোলাঘাটি গ্রামের প্রয়াত মাগ্রাই দেববর্মা, প্রয়াত রাজচন্দ্র সর্দার সহ ৯ জনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে ভক্তঠাকুর ঘাটে অতি সত্বর যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলাম। বিনোদ দেববর্মার নেতৃত্বে গঠিত কমিটির সদস্যগণ ৫ মাইল রাস্তা হেঁটে ঘটনাস্থলে পৌঁছবার পূর্ব মুহূর্তেই পুলিশ ও মিলিটারীরা বিশালগড় থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার মিহির চৌধুরীর আদেশে অতর্কিতভাবে নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর নির্মমভাবে গুলি চালিয়ে ঘটনাস্থলেই ৭ জনকে হত্যা করে এবং অনেকজনকে আহত করে। আহতদের মধ্যে গুলিবায় কবড়া পাড়ার অবস্থাপন্ন ঘরের সরকারী প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক প্রয়াত যদুমোহন দেববর্মা ও প্রমোদ নগর গ্রামের দেবেন্দ্র পাড়ার শ্রীহরি রায়

দেববর্মার আঘাত খুবই সাংঘাতিক ছিল।

ঘটনাস্থলে যাদের মৃত্যু ঘটেছে তাদের নাম ও ঠিকানা :

১। ইন্দ্রকুমার দেববর্মা, পিতা-রামহরি দেববর্মা
কালিদণ্ড পাড়া, লাটিয়াছড়া।

২। সতীশ দেববর্মা, পিতা-মৃত গণেশ দেববর্মা
চণ্ডীঠাকুর বাড়ী, বড়জলা।

৩। দেবেন্দ্র দেববর্মা (ডাক নাম দেওয়ান)
সবজয় পাড়া, প্রমোদনগর।

৪। কড়া দেববর্মা, পিতা-মৃত অধর দেববর্মা
ওয়ারুং বাড়ী, পাঠালিয়া।

৫। আকুয়া দেববর্মা, পিতা মৃত কসম দেববর্মা
রুমতাং ছড়া, পাঠালিয়া ঘাট।

৬। বাগমার একজন দেববর্মা নাম অজ্ঞাত।

৭। গাছি মিঞা—বড়জলা গ্রাম।

আহতদের নাম ও ঠিকানা :

১। শ্রীহরি রায় দেববর্মা, পিতা-মৃত দেবেন্দ্র দেববর্মা, গ্রাম দেবেন্দ্রপাড়া, প্রমোদ নগর।

আঘাত—পিঠে বিরাট গর্ত ও শ্বাস প্রশ্বাস বের হচ্ছিল। কলিকাতার মেডিকেল টিম এসে ঔষধ দিয়ে ভাল করেছিল। তিনি এখনও জীবিত আছেন।

২। যদুমণি দেববর্মা, গুলিরাস কবড়া পাড়া। পায়ে গুলির আঘাতপ্রাপ্ত হন। সারা জীবন লাঠি ভর দিয়ে হেটে কয়েক বৎসর পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৩। ললিত দেববর্মা, রামহরি পাড়া—প্রমোদনগর। আঘাত—পায়ে।

৪। তঘী রায় দেববর্মা, বরকুমার পাড়া, আমতলী।

আঘাত—পুরুষাঙ্গের মুখে গুলি বিদ্ধ হয়েছিল।

৫। নবদ্বীপ দেববর্মা, পিতা-মৃত পুব রায়, প্রমোদনগর। পায়ে গুলি বিদ্ধ হয়েছিল।

৬। নরেন দেববর্মা, পিতা-মৃত লামচন, রামহরি পাড়া, ডান পায়ে উরুতে গুলি লেগেছিল।

৭। রাধা দেববর্মা, পিতা-মৃত—জনক দেববর্মা ১ নং জগাই বাড়ী, ডান হাতে গুলি লেগেছিল।

৮। অশ্বিনী কুমার দেববর্মা, পিতা-মৃত—ওয়াঘী রায় দেববর্মা। গ্রাম—বড়জলা, চণ্ডী ঠাকুর বাড়ী। আঘাত—পিঠে গুলি বিদ্ধ হয়েছিল, তবে ওপরিভাগে গুলি লেগেছিল।

এখানে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন ভক্তঠাকুরঘাটে ঘটনার মূল উদ্যোক্তা সর্দারদের মধ্যে সুধী দেববর্মা লাটিয়াছড়া, ত্রিপুর সক্রিয় মণ্ডল কমিটির সম্পাদক কুসুম সর্দার চিকনছড়া গ্রাম, বড়জলা মণ্ডল কমিটির একজন প্রভাবশালী সর্দার, পূর্ণরাম ঠাকুর পাড়াতে এলাকার বুভুক্ষু জনসাধারণকে ভক্তঠাকুরঘাটে পাঠিয়ে দিয়ে রোহী দলপতিসহ তাঁর বাড়ী মদ্যপানে রত ছিলেন বলে জানা গিয়েছিল। এলাকার জনসাধারণকে নাকি বলেছিল,—"তোমরা যাও, আমরা আসছি"—কিন্তু শেষ পর্যন্ত সর্দার তিনজনই ভক্তঠাকুর ঘাটে যায় নি।

রোহী দলপতির নিকট মিহির দারোগার লিখিত চিঠি উদ্ধারের জন্য লোক পাঠিয়ে অনেক চেষ্টা করেছিলাম। রোহী দলপতির বক্তব্য ছিল ঘটনার দিন সকালে এসে মিহির দারোগা নাকি নিজে তার লিখিত চিঠি নিয়ে গিয়েছিল। কাজেই ঐ চিঠি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

গোলাঘাটি বাজারের উজানে ভক্তঠাকুরঘাটের হত্যাকাণ্ড রাজ্য সরকারের আমলা প্রধানদের এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র। ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন যেভাবে ব্যাপক আলোড়নের ঢেউ রাজ্যব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল ইহাতে ত্রিপুরার তৎকালীন বহিরাগত আমলা প্রধানেরা বিচলিত। ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে প্রথম স্তরে বাঙ্গাল খেদা সাম্প্রদায়িক দোহাই দিয়ে আন্দোলন স্তব্ধ করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, কিন্তু পারেনি। ত্রিপুরা রাজ্যের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে ধ্বংস করার হীন উদ্দেশ্য নিয়েই আমলা প্রধানেরা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে গোলাঘাটির ভক্তঠাকুরঘাটে এলাকার অভাবী জনসাধারণের উপর নির্মমভাবে গুলি চালিয়ে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল।

প্রসঙ্গত ত্রিপুর ক্ষত্রিয় মণ্ডল কমিটির রাজভক্ত সর্দারদের একটি অংশ আমাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সুনজরে দেখেন নি। গ্রামের জনসাধারণের উপর চিরাচরিত প্রভুত্ব বা মাতব্বরী করার ক্ষমতা হারিয়ে যাবে এই আতংকে তাঁরা রীতিমত বিচলিত হয়ে উঠেছিল। রাজতন্ত্র চিরদিনের জন্য লুপ্ত হয়ে যাবে ইহা রাজভক্ত সর্দারদের চিন্তা চেতনার জগতে স্থান পাওয়া রীতিমত কঠিন ছিল। আমাদের আন্দোলনের প্রাথমিক স্তরে কোন কোন এলাকার প্রভাবশালী সর্দারদের বিরোধিতার সম্মুখীন আমাদের হতে হয়েছিল। এই সমস্ত কারণে কোথাও কোথাও অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটেছিল। কমঃ বীরেন দত্তের লিখিত পুস্তিকাতে এই সমস্ত ঘটনার কোন প্রতিফলন বা স্বীকৃতি পর্যন্ত নেই।

কমঃ বীরেন দত্তের লিখিত পুস্তিকার ৫৬ পৃষ্ঠার পঞ্চম লাইনে আমার সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা উল্লেখ করছি। তিনি লিখেছেন—"গণমুক্তি পরিষদকে আত্মরক্ষামূলক প্রস্তুতি শুরু করার সময় না দিয়েই এককভাবে গোলাঘাটির মত অবস্থা সৃষ্টি করে ফেলেছিলেন।"

তিনি পূর্বের লাইনে আরো মন্তব্য করেছেন, "অতি বামপন্থী ঝোঁক যে শেষ

পর্যন্ত অতি দক্ষিণ পন্থী ঝোঁকে পরিণত হয় সেটা কমরেড অঘোর দেববর্মার জীবনে মূর্ত" ইত্যাদি।

গণমুক্তি পরিষদকে আত্মরক্ষামূলক প্রস্তুতি না দিয়েই আমি এককভাবে গোলঘাটির হত্যাকাণ্ড সৃষ্টি করেছিলাম কিনা ইহার বাস্তবতার সহিত মিলিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। কমঃ বীরেন দত্ত আমাকে গোলাঘাটির ঐতিহাসিক হত্যাকাণ্ডের জন্য শুধু দায়ী করেন নি রীতিমত নায়ক হিসেবে দাঁড় করিয়ে ছেড়েছেন। কাজেই অতি দুর্ভাগ্যের সহিত বলতে হয় কমরেড বীরেন দত্তের এই মন্তব্যের সহিত বাস্তব ঘটনার কোন সঙ্গতি নেই। আমার বিরুদ্ধে কমঃ বীরেন দত্তের যদি কোন আক্রোশ বা প্রতিহিংসা না থাকে তিনি এই ধরনের মন্তব্য কোন অবস্থাতেই করতে পারেন না। কারণ ত্রিপুরার রিয়াং বিদ্রোহে তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে তিনি যেভাবে নোয়াখালী জেলার পার্টির নেতৃস্থানীয় কমরেড স্নেহময় দত্ত সহ রিয়াং বিদ্রোহের নেতা রতনমুণীর সহিত ১৯৪২ সনে নোয়াখালি জেলার ছাগলনাইয়া নামক স্থানে রিযাং বিদ্রোহের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনার কথা উল্লেখ করেছিলেন। আমি কমঃ বীরেন দত্তের এই আষাঢ়ে গল্পের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছিলাম। যেহেতু তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে কমঃ বীরেন দত্ত যে সনের কথা জামাতা বিমানবাবুকে দিয়ে লিখিয়েছেন তিনি তখন বৃটিশ জেলে আটক ছিলেন। রতনমুণীর নেতৃত্বে সংঘটিত রিয়াং বিদ্রোহ কোন রাজনৈতিক আদর্শের প্রভাবে প্রভাবিত ছিল না। প্রতিফলনও নেই। কাজেই আমি সঙ্গতকারনেই কমঃ বীরেন দত্তের অসত্য উক্তির প্রতিবাদ করেছিলাম। তাতে কমঃ বীরেন দত্ত আমার উপর তেলে বেগুনে জ্বলে আছেন। তিনি আমাকে শুধু গোলাঘাটি হত্যাকাণ্ডের নায়কই করেন নি, C. I A-এর এজেন্ট বলেও মন্তব্য করতে পিছপা হননি। কমঃ বীরেন দত্তের মত একজন প্রবীন কমিউনিস্ট নেতার পক্ষে আমার বিরুদ্ধে এই ধরনের জঘন্য মন্তব্য করা সঙ্গত হয়েছে কিনা ইহা সহৃদয় পাঠকবর্গ ঘটনাপ্রবাহের বাস্তবতার বিচার বিশ্লেষণ নিশ্চয়ই করবেন।

কারন গোলাঘাটির হত্যাকাণ্ডের ঘটনার আগের দিন পর্যন্ত আমি উক্ত এলাকায় ছিলাম না। ঘটনার দিন বিকেলে আমি ঐ এলাকায় পেঁছেছিলাম। তখন কিছু করার মত কোন অবস্থা ছিল না। তথাপি শ্রীবিনোদ দেববর্মার নেতৃত্বে ৯ জনকে নিয়ে কমিটি গঠন করে অবস্থা আয়ত্বে আনার জন্য চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আমার গঠিত কমিটির সদস্যগণ ঘটনাস্থলে পেঁছাবার পূর্বেই নিরস্ত্র জনতার উপর নির্বিচারে গুলি চালিযে হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছিল। কাজেই কমরেড বীরেন দত্তকে আমি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করি যেখানে আমি এলাকাতেই ছিলাম না সেখানে আমি কি করে গণমুক্তি পরিষদকে আত্মরক্ষামূলক প্রস্তুতি শুরু করার সময় না দিয়ে এককভাবে গোলাঘাটির মত ঘটনা সৃষ্টি করেছিলাম? জানি না তিনি কি উত্তর দেবেন। গোলাঘাটির

হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার সময় কমঃ বীরেন দত্ত জেলে আটক ছিলেন। এই প্রসঙ্গে আমি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করছি।

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করতে হয় গোলাঘাটির ভক্তঠাকুরঘাটে বিজয় নদীর বালুকা চড়ে হত্যাকাণ্ড ঘটনার পূর্বে সমগ্র এলাকার মধ্যে তখন পর্যন্ত আত্মরক্ষা-মূলক প্রতিরোধ সংগ্রামের কোন রকম প্রস্তুতি ছিল না। ১৯৪৮ সনের ১৫ই আগষ্ট গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী দিবস হিসাবে আগরতলায় আমার নেতৃত্বে বে-আইনী অবস্থায় যে বিরাট শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ইহার সুদূর প্রসারী পরিণতি ত্রিপুরার উপজাতি জনগোষ্ঠী ও গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন এ রাজ্যের মুসলমান, মনিপুরী ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যেও দারুন উৎসাহ ও আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তবে সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামের জন্য গণমুক্তি পরিষদের কোন সিদ্ধান্ত গোলাঘাটির হত্যাকাণ্ডের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্তও ছিল না। কাজেই গোলাঘাটির ভক্তঠাকুরঘাটে বুভুক্ষু জনসাধারণের উপর মিহির দারোগার নেতৃত্বে যে ভাবে গুলি চালিয়ে নির্মম হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করা হয়েছিল তাতে এলাকার জনসাধারণ প্রচণ্ডভাবে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল।

হঠাৎ করে এলাকায় ক্যাপদার বন্দুক সংগ্রহ করে রাইফেলস্ ও মেসিনগানের মোকাবিলা করার মতন অবস্থাও ছিল না। সেই রকম সংগঠনও ছিল না। তৎমুহূর্তে ব্যক্তিগত ঝুঁকি নিয়ে ক্যাপদার বন্দুক সংগ্রহ করে ক্যাম্পের মিলিটারীদের রাইফেলস, ও মেসিনগানের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমনের চেষ্টা করলে আরও বহুলোকের প্রাণহানি ঘটত। তাছাড়া এলাকার প্রাক্তন সৈনিকরা পর্যন্ত ক্যাপদার বন্দুক দিয়ে রাইফেলস্ ও মেসিনগানের মোকাবিলা করতে প্রস্তুত ছিল না। তদুপরি গণমুক্তি পরিষদের কোন সিদ্ধান্তও ছিল না। কাজেই এককভাবে দায়িত্ব নিয়ে এই ঝুঁকি নেওয়া আমি যুক্তিসঙ্গত মনে করি নাই। তাই উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে জরুরী আলোচনার জন্য ঘটনার পরের দিন তিনবার লোক পাঠিয়ে লাটিয়াছড়া গ্রাম থেকে সদর উত্তরে চাচু বাজারের নিকটে দেবরা পাড়াতে একদিন হেটে কমঃ দশরথের সহিত সাক্ষাৎ করেছিলাম। ঐ দিনই আমরা দুইজন দেবরা-পাড়া দিয়ে বড়মুড়াতে উঠে গিয়েছিলাম এবং রাত্রে একটা বাড়ীতে গোলাঘাটির হত্যাকাণ্ডের বিস্তৃত আলোচনা করেছিলাম। আমার পদক্ষেপগুলি তিনি সমর্থন করেছিলেন। এবং পরবর্তী পদক্ষেপ কি হওয়া উচিত তা নিয়েও বিস্তৃত আলোচনা হয়েছিল। তাতেও দুইজনের ঐক্যমত ছিল। মোটের উপর গোলাঘাটির হত্যাকাণ্ডের পর গণমুক্তি পরিষদের আন্দোলন নূতন মোড় নিতে আরম্ভ করেছিল। বাস্তব অবস্থার চাপে পড়ে গণমুক্তি পরিষদকে তখন সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত করতে হয়েছিল। এলাকার জনসাধারনের লাইসেন্সপ্রাপ্ত সমস্ত বন্দুকগুলি সংগ্রহ করে গেরিলা বাহিনী গঠন করে প্রতিরোধ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করা হয়েছিল। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন গোলাঘাটির হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে আমি নাকি ভয়ে এলাকা থেকে

পালিয়ে গিয়েছিলাম। কমঃ দশরথ 'জ্বালা' পত্রিকায় এই মন্তব্য করেছিলেন।

কমঃ দশরথের এই মন্তব্য অতি দুর্ভাগ্যজনক কারন তার এই মন্তব্য যে কত বড় মিথ্যা ইহা কমঃ দশরথ পরবর্তী লাইনে বলেছেন—"কমঃ অঘোর অবশ্য গোলাঘাটির হত্যাকাণ্ডের ঘটনার আলোচনার পর মুহূর্তেই আবার এলাকায় চলে যায়"। আমি কমঃ দশরথের সহিত মাত্র একরাত্রি ছিলাম। আলোচনা সমাপ্ত হওয়ার পর মুহূর্তেই আবার এলাকায় চলে আসি এবং আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থাদি করেছিলাম। এলাকাতে আমার বিরুদ্ধে বিক্ষোভের কোন কারনও ছিল না। ত্রিপুরা রাজ্যের আন্দোলনের ইতিহাসে আমার দুঃসাহসিকতা বিভিন্ন সময়ে প্রমানিত।

১৯৪৮ সনের ১৫ই আগস্ট আমি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা, জীবিত কিংবা মৃত ধরতে পারলে পুরষ্কার ঘোষিত থাকা সত্বেও আগরতলায় বে-আইনী মিছিল পরিচালনা করা এবং উমাকান্ত মাঠে জোর পূর্বক ঢুকে টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখা, কতটুকু মনোবল ও সাহসিকতা থাকলে ইহা সম্ভব হতে পারে ইহা কমঃ দশরথের অজ্ঞাত ছিল না।

তদুপরি কমঃ বীরেন দত্তের পুস্তিকার ৫৬ পৃষ্ঠার শেষ প্যারাগ্রাফে কমঃ দশরথের লিখিত গণমুক্তি পরিষদের জন্মকথা থেকে উদ্ধৃত করেছেন।

কমঃ দশরথ লিখেছেন, "১৯৪৮ সনের ৩০শে বা ১৫ই আগস্ট ত্রিপুরার রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। সেদিন ত্রিপুরা গণমুক্তি পরিষদের নেতৃত্বে ১৫ হাজার সুসংগঠিত জনতার এক বিশাল মিছিল দুর্গা চৌধুরী পাড়া থেকে রওনা হয়ে আগরতলা শহর পরিক্রমা করেছিল। উমাকান্ত মাঠে প্রায় আধ ঘণ্টার মত জনসভা করে ফিরে এসেছিল। পুস্তিকার ৫৭ পৃষ্ঠার শেষ প্যারাগ্রাফের শেষে তিনি লিখেছেন "এখানে বলা আবশ্যক যে তখন দশরথ দেব, সুধন্ব্যা দেববর্মা হেমন্ত দেববর্মার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ঝুলছিল"।

এখানে প্রসঙ্গত আলোচনা করতে হয়,—দুর্গাচৌধুরী পাড়া থেকে আগরতলা শহর পরিক্রমা করার সময় কে মিছিলের পুরোভাগে থেকে স্লোগানের পর স্লোগান দিয়ে মিছিল পরিচালনা করেছিল? এবং উমাকান্ত মাঠে জনসভায় প্রধান বক্তা হিসাবে কে বক্তব্য রেখেছিল? কমঃ দশরথ এই প্রসঙ্গে অনেক কথা লিখেছেন বটে কিন্তু ঐ দিনের বে-আইনী শোভাযাত্রার মূল পরিচালক ও উমাকান্ত মাঠের প্রধান বক্তা ও সভাপতির নাম উদ্দেশ্যমূলকভাবে চেপে গিয়েছেন।

জানা থাকা প্রয়োজন; ঐ দিনের বে-আইনী মিছিল পরিচালনার দায়িত্ব যদি আমি স্বেচ্ছায় গ্রহণ না করতাম অবস্থা বড় জটিল হয়ে উঠত। তখন পর্যন্ত

আগরতলায় বে-আইনী মিছিল পরিচালনা করার মত দায়িত্বশীল ও সাহসী জংগী কর্মী গণমুক্তি পরিষদ সৃষ্টি করতে পারেনি। ত্রিপুরার উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে রাজনৈতিক দাবী দাওয়া নিয়ে এই ধরনের মিছিল ইতিপূর্বে কোনদিন হয়নি। উপজাতি জনতার মুখ দিয়ে "জিন্দাবাদ" স্লোগান দেওয়ানই রীতিমত কঠিন ছিল। জিন্দাবাদ বললে 'জিংগাবার' বলত, কারণ কথাটি সম্পূর্ণ নূতন ও প্রথম ছিল।

কমরেড দশরথ ঐ দিনের মিছিলকে ত্রিপুরার রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন বলে স্বীকার করেছেন। কিন্তু যে ব্যক্তি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা অগ্রাহ্য করে এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বে-আইনী মিছিল পরিচালনা করেছিল তদুপরি উমাকান্ত মাঠে জোর করে সভা করে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রেখেছিল সেই অঘোর দেববর্মা এবং সভাপতি চড়িলাম M. E স্কুলের প্রধান শিক্ষক মমতাজ মিঞার নাম উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি। তদুপরি কমঃ দশরথ লিখেছেন—"দশরথ দেব, সুধন্ব্যা দেববর্মা ও হেমন্ত দেববর্মার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ঝুলছিল। কিন্তু তখন অঘোর দেববর্মার নামে কি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ঝুলছিল না ?

কমঃ বীরেন দত্তের পুস্তিকার ৫৮ পৃষ্ঠার মাঝামাঝিতে কমঃ দশরথ আবার লিখেছেন—"আমাকে এবং কমঃ সুধন্ব্যাকে কিছুতেই মিছিলে যেতে দেওয়া হবে না"—ইত্যাদি। কমঃ দশরথের এই বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কারণ জনসাধারণের জোর দাবী ছিল হয় দশরথ অথবা সুধন্ব্যা দুইজনের মধ্যে একজনকে মিছিলে যেতেই হবে। নতুবা জনসাধারণ মিছিল না করে বাড়িতে ফিরে যাবে। কমঃ সুধন্ব্যা সোজাসুজি অস্বীকার করাতে জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। কমঃ দশরথ নিজে মিছিলে না যাওয়ার জন্য যুক্তির পর যুক্তি দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করে প্রাণান্ত, কিন্তু জনসাধারণের বিক্ষোভ ক্রমশঃ ধূমায়িত হয়ে উঠছিল। নিজেদের দুর্বলতার জন্য আমার নাম প্রস্তাব করার সাহসও তাঁদের ছিল না। তখন আমি অবস্থার জটিলতা উপলব্ধি করে স্বেচ্ছায় মিছিল পরিচালনা করার জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করে জনতার মধ্যে ঘোষণা করেছিলাম। তাতে জনসাধারণ শান্ত হয় এবং জটিলতার পরিসমাপ্তি ঘটে। কমঃ দশরথ আত্মপক্ষ সমর্থন করে অনেক যুক্তি দিয়ে বিক্ষুব্ধ জনতাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু মিছিল পরিচালনার দায়িত্ব কে নেবে তা বলতে পারেন নি, তাতে জনসাধারণও তাঁদের দাবীতে অনড় ছিলেন। কমঃ হেমন্তকে অনেক বুঝিয়ে মিছিলে পাঠান হয়েছিল কিন্তু মিছিল পরিচালনা বা স্লোগান দেওয়া কিংবা জনসভা কোনখানেতেই তাঁর বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল না। তাকে গ্রেপ্তার করার কোন রকম প্রচেষ্টা করা হয়েছিল বলে আমার জানা নেই। গ্রেপ্তারের লক্ষ্য ছিলাম একমাত্র আমি। কাজেই ঐ মিছিলের সময় পর্যন্ত কমঃ সুধন্ব্যা ও কমঃ হেমন্ত দেববর্মার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের হয়েছিল কিনা ইহা রাজ্য সরকারের দলিল থেকে সঠিক তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

কমঃ দশরথের এত বিস্তৃত লেখার মধ্যে আমার নাম একটিবার মাত্র উল্লেখিত আছে। শুধুমাত্র বলেছেন—"কমরেড অঘোর দেববর্মা এবং কমরেড হেমন্ত দেববর্মা উৎসাহের সাথে মিছিলের দায়িত্বভার গ্রহণে রাজী হয়েছিলেন।"

গণমুক্তি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে আমি ঐ মিছিলে যে দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলাম কমঃ দশরথ দেব তাও স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত নহেন। কি জটিল অবস্থার মধ্যে আমাকে স্বেচ্ছায় এই দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয়েছিল ইহা আমি ইতিপূর্বে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি। এমন কি তৎসময়ে আমার নামে যে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছিল ইহাও তিনি উদ্দেশ্যমূলকভাবে উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি। তাতে আমার কিছু যায় আসে না। ইহাতে কমরেড দশরথ দেব যে সংকীর্ণতার পংকিলতায় আচ্ছন্ন ইহাই প্রমাণিত হবে। কমরেড দশরথ দেবের জানা থাকা প্রয়োজন কোন ঐতিহাসিক ঘটনা লিখতে হলে অত্যন্ত নিরপেক্ষ, উদারমন ও সংযতভাবে লেখা দরকার। তিনি মনগড়া ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এবং ব্যক্তিবিশেষকে হেয় করার মনোবৃত্তি নিয়ে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি লিখে থাকলে ইহাই ইতিহাস হবে ইহা মনে করার কোন কারণ নেই। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করতে হচ্ছে, ত্রিপুরায় বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি পরিষদের ঐতিহাসিক প্রতিরোধ সংগ্রাম তথ্যচিত্র হিসেবে রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা বামফ্রণ্ট সরকার যে গ্রহণ করেছিল ইহা অভিনন্দন-যোগ্য। এই তথ্যচিত্র তোলার জন্য কলিকাতার বিশ্ববিখ্যাত চিত্র শিল্পী মৃণাল সেন মহোদয়কে Contract Basis-এ দায়িত্বও দিয়েছিল। রাজ্য সরকার এই বাবদে লক্ষ লক্ষ টাকাও ব্যয় করেছিল।

মৃণালবাবু এসে খোয়াই বিভাগের বাইজাল বাড়িতে ছবি তোলার সময় আমাকেও সেখানে উপস্থিত করা হয়েছিল। তথ্যচিত্র তোলার আগে কমরেড দশরথ দেব এই ব্যাপারে পদ্ধতিগত কি হওয়া উচিত উপস্থিত কাহারও সাথে কোন রকম আলোচনা করেছেন বলে আমার জানা নেই। মুক্তি পরিষদ সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে মামুলি আলোচনা করা হয়েছিল। আমি তখন খুবই অসুস্থ। তবুও একটি প্রস্তাব সংযোজন করেছিলাম। কিন্তু যথাসময়ে দেখা গেল গণমুক্তি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আমার কোনরকম ভূমিকা পালনের কোন ব্যবস্থা নেই। মঞ্চে বসে থাকাই ছিল আমি সহ অন্যান্যদের একমাত্র কাজ। একবার মাত্র উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। হয়ত ফটো তুলেছিল। অন্যান্যদেরও একই অবস্থা। যা করেছেন কমরেড দশরথ দেব একা। বিগত মুক্তি পরিষদের প্রতিরোধ সংগ্রাম যেন তিনি একাই সংগঠিত করেছেন। এবং গ্রামে গ্রামে প্রচারও করেছেন। মিলিটারী পুলিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামও করেছেন। গণমুক্তি পরিষদ সম্মেলনে প্রস্তাব উত্থাপন ইত্যাদিও তিনি একাই করেছেন। গণমুক্তি পরিষদের অন্যান্য নেতৃত্ব বা কর্মীরা নির্বাক দর্শকের ভূমিকায় বসে থেকেছেন। কমরেড দশরথ দেবের ধ্যান ধারণা হচ্ছে বিগত ত্রিপুরার ঐতিহাসিক প্রতিরোধ সংগ্রাম তিনি

একাই করেছেন। তিনি সংগ্রামে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়েছেন, ইহা কেহই অস্বীকার করবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি আন্দোলনের জীবনে কোনদিন কোনরকম ঝুঁকি পর্যন্ত নেয়নি, বরাবর বুদ্ধিমান হিসেবে অন্যের ঘাড়ে বন্দুক রেখে শিকার করেছেন, পুলিশের গ্রেপ্তার এড়ানই যার প্রধান লক্ষ্য ছিল সেই ব্যক্তি কমঃ দশরথ যদি মনে করে থাকেন ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম তিনিই একমাত্র করেছেন, আর অন্যেরা শুধু দর্শক, তাহলে ইহার মত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা আর কি হতে পারে ?

কমরেড দশরথ দেব তথ্যচিত্রটি তোলার সময় যেভাবে ব্যক্তিগত মাত্রাহীন আত্মপ্রচারে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন তার প্রমাণ হচ্ছে তথ্যচিত্র। যাঁদের এই তথ্যচিত্র দেখাব সৌভাগ্য ঘটেছে তাঁদের মধ্যে কেহ প্রসংশা করেছে বলে জানা নেই। তবে আমার এই তথ্যচিত্র দেখার সৌভাগ্য ঘটেনি। আমি ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ছিলাম। তথ্যচিত্রে ভূমিকা দূরের কথা আমার ছবি দেখাও নাকি দুষ্কর। কমবেড দশরথ ত্রিপুবার অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা ও সকলের শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি। ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব কেহই অস্বীকার করবে না, কবার কোন কারণও নেই। কিন্তু চিত্রশিল্পী মৃণাল সেনের সংযোজিত তথ্যচিত্রটি কমরেড দশরথ দেব যেভাবে দাঁড় করিয়েছেন তাতে শেষ পর্যন্ত বামফ্রণ্ট সবকারও বাধ্য হয়ে জনসাধারণকে দেখানো অযোগ্য বলে বিবেচনা করে তথ্যচিত্রটিই বাতিল করেছেন। অথচ রাজ্য সরকারকে এই তথ্য চিত্র রূপায়নের বাবদে কয়েক লক্ষ টাকা গচ্চা দিতে হয়েছে।

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন কমঃ বীরেন দত্ত পুস্তিকার ৫৩ পৃষ্ঠার শেষ প্যারাগ্রাফের দ্বিতীয় লাইনে তিনি লিখেছেন "রামনগর সুতারমুড়া অঞ্চল থেকে জম্পুই এলাকা ধরে মিলিটারী বাহিনী ১৯৪৯ সালে যে গ্রামগুলি জ্বালিযে দিযেছিল তার মধ্যে রযেছে জিরানিয়া থানার মাথাম বাড়ি, দামতা বাড়ি, কবাই পাড়া, পুইয়্যাচাঁদি বাড়ি, বিশ্রাম বাড়ি, সিপাই পাড়া, নবজান পাড়া, এবং বেল বাড়ি ইত্যাদি বাড়িগুলির অবস্থান কোথায কমঃ বীরেন দত্তের কোন ধ্যান ধারণা আছে বলে আমার মনে হয় না। জিরানিয়া থানার অন্তর্গত হলেও বাড়ীগুলি অধিকাংশই সদর উত্তরে অবস্থিত।

কমরেড বীরেন দত্তের জানা থাকা প্রয়োজন সদর দক্ষিণ আন্দি অঞ্চলে একমাত্র সুতারমুড়া গ্রামে কমঃ সুধন্ব্যার ঘর জ্বালান হয়েছিল। বিশ্রাম গঞ্জ এলাকার হীরাপুর গ্রামে রামদুর্গা বাড়ির সুরেন্দ্র দেববর্মার ঘরটি জ্বালান হয়েছিল। চম্পকনগর-এর আশেপাশে বেশ কয়েকটি পাড়ায় মিলিটারীরা অগ্নিসংযোগ করেছিল। কাজেই কমঃ বীরেন দত্তের লিখিত,—"সুতারমুড়া অঞ্চল থেকে জম্পুইজলা এলাকা ধরে মিলিটারী বাহিনী ১৯৪৯ সনে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল"—ইহা অতিরঞ্জিত, বাস্তবের সহিত কোন সঙ্গতি নেই। তবে আগুন না জ্বালালেও স্থানীয় তৎকালীন কংগ্রেসী গুণ্ডারা সদর দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে মিলিটারী

ও পুলিশের সাহায্যে অনেক অত্যাচার ও উৎপীড়ন চালিয়েছিল। কিন্তু সদর দক্ষিণের জংগী মনোভাবাপন্ন জনসাধারণ, অত্যাচারী পুলিশ বিভাগে কর্মরত ও কংগ্রেসী গুন্ডাদের কাহাকেও ক্ষমা করে নাই। ইহা কমঃ বীরেন দত্তের অজানা থাকার কথা নহে। এই প্রসঙ্গে আমি বিস্তৃত আলোচনা করতে চাই না। যদি প্রসঙ্গত কমঃ বীরেন দত্ত ও কমঃ দশরথ দেবকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করা হয় প্রতিরোধ সংগ্রাম করতে গিয়ে মিলিটারীদের সহিত সংঘর্ষে খোয়াই বিভাগে কোন পুলিশ বা মিলিটারীর জীবনহানির ঘটনার নজীর আছে কিনা? কমঃ দশরথ দেব ও কমঃ বীরেন দত্তের পক্ষে তথ্য ও ঘটনা দিয়ে সরাসরি উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে না। তবে খোয়াই বিভাগের জনসাধারণ চা-বাগান কিংবা বস্তীর হিন্দুস্থানী সাঁওতাল, মুণ্ডা ইত্যাদি সম্প্রদায়ভুক্ত জনতার সান্নিধ্যে থেকে তীর-ধনুক চালানোতে রীতিমত ওস্তাদ ইহা অনস্বীকার্য। সদর দক্ষিণের জনসাধারণ তীর ধনু চালানোর ব্যাপারে অভ্যস্ত নহে।

চতুর্থ পর্ব

পুস্তিকার ৫৬ পৃষ্ঠায় তৃতীয় লাইনে কমরেড বীরেন দত্ত আমাকে 'অতি বামপন্থী ঝোঁক' বলে মন্তব্য করে যে সমস্ত যুক্তির অবতারণা করেছেন এই প্রসঙ্গ আবার উল্লেখ করতে হচ্ছে। কারন তৎসময়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক লাইন সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে হলেও আলোচনা করা প্রয়োজন, ১৯৪৮ সনে কলকাতায় মহম্মদ আলী পার্কে কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসে কমরেড রনদিভের উত্থাপিত রাজনৈতিক প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর কমঃ বনদিভেকে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়েছিল. ইহার পূর্বে প্রয়াত কমরেড পি. সি যোশী পার্টির ক্রেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাব মতো ভারতের ধনিক শ্রেণী পরিচালিত জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহিত আপোষ চুক্তি করে যে স্বাধীনতা লাভ করেছে সেই স্বাধীনতাকে ভূয়া বা 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়' বলে ঘোষনা দিয়েছিল। এবং কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতারা ভারতের মজুর, কৃষক, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবি ও মেহনতি জনসাধারণকে ধোঁকাবাজী দিয়েছে বলে স্লোগান দিয়েছিল। কংগ্রেস পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারকে টাটা বিড়লাব সরকার বলে স্লোগান দেওয়া হয়েছিল। তৎসময়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সদ্য প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীদের পরিচালিত কংগ্রেস সরকারকে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে উৎখাত করে দেশের শ্রমিক কৃষক ও মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব নিয়ে সরকার গঠনের স্লোগান দিয়েছিল। সশস্ত্র বিপ্লবের স্লোগান বা কর্মসূচী বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা হিসেবে পার্টি কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনের পূর্বেই দায়িত্বপ্রাপ্ত পার্টি নেতৃত্বের একাংশ আত্মগোপন করে যথাস্থানে চলে যেতে আরম্ভ করেছিল।

গ্রামাঞ্চলে কমিউনিস্ট পার্টির অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে সরকারী অফিস ও থানা ইত্যাদি দখল করে মুক্ত এলাকা ঘোষণা করা, শহরগুলিতে সরকারী ঘোষিত নিষেধাজ্ঞা আগ্রাহ্য করে জংগী শোভাযাত্রা বের করে জেলের ফটক ভেঙ্গে P. D. Act-এ আটক বন্দীদেরও জেল ভেঙ্গে বের হওয়ার কিংবা জেলখানায় লালঝাণ্ডা তোলার কড়া নির্দেশ ইত্যাদি ছিল। পশ্চিমবাংলার মেদিনীপুর

জেলার কাকদ্বীপ ও অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেঙ্গানা ইত্যাদিতে মুক্ত এলাকাও ঘোষিত হয়েছিল। এভাবে সুনির্দিষ্ট তারিখে সারা ভারত ডাক ও তার বিভাগের কর্মীদের এবং সারা ভারত রেল শ্রমিকদের, তাছাড়া বিভিন্ন কলকারখানার শ্রমিকদের সারা ভারত শ্রমিক সংগঠনের মাধ্যমে আহ্বান দেওয়া হয়েছিল যাতে একইদিনে কাজ বন্ধ করে পার্টির বৈপ্লবিক কর্মসূচী রূপায়নের জন্য। পার্টি কর্মীদের মধ্যে যদি মানসিক দুর্বলতা কিংবা দোদুল্যমানতা দেখা যায় তা হলে তাদেরকে শত্রুর দালাল সন্দেহ করে সন্দেহভাজন কর্মীদের চিহ্নিত করার প্রোগ্রামও ছিল। ডাক ও তার বিভাগ-এর কর্মীদের এবং রেল ও কারখানার শ্রমিকদের একদিনের ব্যাপক ও সর্বাত্মক ধর্মঘটের আহ্বান সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। এইভাবে সারা ভারতব্যাপী পার্টির ঘোষিত সুনির্দিষ্ট তারিখে বিপ্লব শুরু করার কর্মসূচী ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারও বসে ছিল না। পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করে P. D. Act চালু করে হাজার হাজার কমিউনিস্ট পার্টি কর্মীদের বিনা বিচারে জেলে আটক করেছিল। পার্টির বৈপ্লবিক কর্মসূচী জনবিচ্ছিন্ন হয়ে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে পরিণত হল। পার্টির বৈপ্লবিক কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে বহু পার্টি কর্মীদের অমূল্য জীবন দিতে হয়েছিল। কমরেড বীরেন দত্ত আমাকে গোলাঘাটিতে হত্যাকাণ্ডের জন্য অতি বামপন্থী ঝোঁকের অপরাধে অভিযুক্ত করেছেন, কিন্তু পার্টি কংগ্রেসেব গৃহীত বৈপ্লবিক কর্মসূচী কি অতি বামপন্থী ঝোঁক বলে পরবর্তী সময়ে পার্টি কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়নি? কমরেড বীরেন দত্ত পার্টি কংগ্রেসের এই গৃহীত কর্মসূচীর বিরোধিতা করেছেন বলে আমার জানা নেই। তিনি বাহ্যত অতি বিপ্লবীই ছিলেন। পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে কমরেড রণদিভের উত্থাপিত রাজনৈতিক প্রস্তাবের কড়া সমর্থক বলেই জানতাম। কিন্তু পার্টি কংগ্রেসের গৃহীত বৈপ্লবিক কর্মসূচী বাস্তবে রূপ দিতে গিয়ে তিনি রীতিমত বিভ্রান্ত ও আতংকিত হয়ে পড়েন। তাই তিনি আমার মত অনভিজ্ঞ ও পার্টির নবাগত কর্মীর উপর তৎকালীন পার্টির বৈপ্লবিক কর্মসূচী রূপায়নের সমস্ত দায়দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে নিজে বুদ্ধিমানের মত দায়িত্ব এড়িয়ে স্বেচ্ছায় কারাবরন করেছিলেন। আমি পার্টির বৈপ্লবিক কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যদি অতি বামপন্থী ঝোঁকের অপরাধী হয়ে থাকি তাহলে কমরেড বীরেন দত্তকেও পার্টির বৈপ্লবিক কর্মসূচী কার্যকরী করার দায়িত্ব এড়িয়ে স্বেচ্ছায় কারাবরণ করার জন্য পার্টির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলা যাবে না কেন? অবশ্য আত্মগোপন করে থাকার মত কমঃ বীরেন দত্তের শারিরীক অবস্থাও ছিল না। তিনি যদি আত্মগোপন করে থাকতেন অনিবার্য কারনে মৃত্যুকে বরন করে নিতে হত। তখন পর্যন্ত ত্রিপুরার পাহাড় জঙ্গলে চিকিৎসক বা চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা ছিল না। অতএব বেঁচে থাকার প্রয়োজনে তিনি যা করেছেন ইহাকে আমি অপরাধ বলে মনে করি না।

পার্টি কংগ্রেসের পরবর্তী অবস্থা

কমরেড বীরেন দত্ত ও আমি কলকাতা পার্টি কংগ্রেসের পর আগরতলায় ফিরে এলে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ১৯৪৬ সন থেকে আগরতলায় যে সমস্ত ছাত্র, যুবক অত্যন্ত উৎসাহের সহিত পার্টির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কমরেড বীরেন দত্তের পিছনে পিছনে রাস্তায় দল বেঁধে চলত এবং চায়ের দোকানে বসে বসে শ্রমিক ও কৃষক বিপ্লবের তুফান তুলত, পার্টির সশস্ত্র বিপ্লবের কর্মসূচী গৃহীত হওয়ার পর পার্টি যখন বে-আইনী ঘোষিত হল এবং P. D. Act চালু করা হল তখন তাদের অধিকাংশ পার্টির সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে ধীরে ধীরে সরে যেতে থাকেন। কেহ কেহ পারিবারিক অসুবিধার অজুহাতে পার্টির সক্রিয় ভূমিকা থেকে সরে যেতে থাকেন, প্রাক্তন কমরেড নিমাই দেববর্মা তাদের অন্যতম। কমঃ দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত তখন ত্রিপুরা রাজ্য ইউনিটের সম্পাদক ছিলেন।

আমার জানা মতো তৎসময়ে ১৯৪৮ সন পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির কাজকর্ম প্রধানত আগরতলায় সীমাবদ্ধ ছিল। কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালিত রাজ্যভিত্তিক কৃষক সংগঠন কিংবা অন্য কোন রকম গণ সংগঠন ছিল না। ছাত্র ফেডারেশন ছিল, কিন্তু রাজ্যভিত্তিক ছিল না। রাজ্য প্রজামণ্ডল কমিউনিস্ট পার্টির গণসংগঠন ছিল না। প্রজামণ্ডল সংযুক্ত রাজনৈতিক ফ্রন্টের মত ছিল। কমিউনিস্ট পার্টি প্রজামণ্ডলের একটি অংশীদার মাত্র ছিল। প্রজামণ্ডলের মূল নেতৃত্বে ছিল প্রয়াত প্রভাত রায় ও প্রয়াত বংশীঠাকুর। উভয়েই প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন ছিল। কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, কিন্তু পার্টির সদস্য ছিলেন না।

দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত বৈপ্লবিক কর্মসূচী, সোভিয়েত রাশিয়ার বৈপ্লবিক ইতিহাস ও ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ইত্যাদি ধারাবাহিকভাবে একনাগাড়ে একমাস পার্টির ক্লাশ করা হয়েছিল। কমরেড দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত পার্টির রাজ্য ইউনিটের সম্পাদক ও তাত্ত্বিক নেতা হিসেবে ক্লাশ পরিচালনা করেছিলেন: স্থান ছিল আগরতলা বনমালীপুর প্রয়াত গৌরাঙ্গ দেববর্মার বাড়ীতে। তৎসময়ে প্রয়াত গৌরাঙ্গ দেববর্মার বাড়ীর পশ্চিম অংশে বিস্তীর্ণ খালি জায়গা ছিল। সেই খালি জায়গার মধ্যে বাড়ীর পূর্বপুরুষদের নির্মিত একটি বিরাট আবাসিক ঘর ছিল। এই ঘর বরাবরই খালি ছিল। ঘরের আশেপাশে বিরাট বিরাট আম, কাঠাল, লিচু গাছ ও মাধবীলতা ফুল গাছের লতাগুলি আম ও কাঁঠাল গাছগুলিতে ঝুলে ছিল। স্থানটিতে পুরানো দিনের বর্ণিত তপোবনের পরিবেশ বিদ্যমান ছিল। প্রয়াত গৌরাঙ্গ দেববর্মার মাতা শ্রীমতি হেমপ্রতিভা দেববর্মা কমিউনিস্ট পার্টির একান্ত সমর্থক ও সহানুভূতিশীল ছিলেন। বিশেষ করে কমরেড বীরেন দত্তের প্রতি

তিনি খুবই সহানুভূতিশীল ছিলেন। আগরতলায় উদ্বাস্তু আগমনের সময় পার্টি'র নেতৃত্বে P. R. C-র কাজ চলাকালীন তিনি কমঃ বীরেন দত্তকে পুরানো আমলের বড় মজবুত একটি টেবিলও দিয়েছিলেন। টেবিলটি কমঃ বীরেন দত্তের বাড়ীতে বহুদিন দেখা গিয়েছিল। কমরেড বীরেন দত্তের অতি দুর্দিনের সময় বড় মেয়ে অরুনাকে দুধ খাওয়ানোর জন্য প্রয়াত গৌরাঙ্গ দেববর্মার মাতা হরিনা রংয়ের বাচ্চাসহ একটি ছাগলও দিয়েছিলেন। তদুপরি কমঃ বীরেন দত্তকে দুর্দিনের সময় তিনি কতরকমভাবে সাহায্য ও সহায়তা করেছিলেন ইহার বহু নজীর তুলে ধরা যায়। তদুপরি প্রয়াত গৌরাঙ্গ দেববর্মার বাড়ীতে এক নাগাড়ে একটি মাস পার্টি ক্লাস চলার সময়ও পার্টি কর্মীদের টিফিন ও চা ইত্যাদি খাওয়ানো বাবদ সমস্ত খরচ তিনিই বহন করেছিলেন। মাঝে মধ্যে পার্টি কর্মীদের যাদের আগরতলায় থাকা ও খাওয়ার সংস্থান ছিল না, তাঁদেরকে বাড়ীতে রেখে মাসের পর মাস থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। যথা— কল্যান চক্রবর্তী ও বাসুদেব ভট্টাচার্য প্রমুখ। আত্মগোপন করে থাকার সময় শহর ও গ্রামের যোগাযোগ রক্ষার প্রয়োজনে অনবরত গৌরাঙ্গ দেববর্মার বাড়ীতে কর্মীরা আসা যাওয়া করত। তাঁদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থাও তিনিই করতেন। প্রয়াত গৌরাঙ্গ দেববর্মার মাতৃদেবী ও আমার শ্বাশুড়ী শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতি হেমপ্রতিভা দেববর্মার ত্রিপুরায় পার্টি গঠনের ক্ষেত্রে অবদান ও ব্যক্তিগতভাবে কমঃ বীরেন দত্তকে দুর্দিনের সময় সাহায্য সহায়তা করার কথা তিনি (কমঃ দত্ত) কোন অবস্থাতেই অস্বীকার করতে পারবেন না। কমরেড বীরেন দত্ত তার লিখিত স্মৃতিকথায় প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে অনেকের নাম বার বার উল্লেখ করেছেন। পার্টি'র দুর্দিনে যাদের কোনরকম ভূমিকা ছিল না তাঁদেরকে তিনি বিপ্লবী বলে উল্লেখ করে আত্মস্বান্তনা পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। অথচ কমরেড বীরেন দত্ত স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ভুলেও প্রয়াত গৌরাঙ্গ দেববর্মা ও তাঁর মাতৃদেবী শ্রীমতি হেমপ্রতিমা দেববর্মার ভূমিকা দূরের কথা নামটি পর্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। কমরেড বীরেন দত্ত যখন প্রথম সাধারণ নির্বাচনে জয়যুক্ত হয়ে লোকসভার সদস্য হলেন অর্থাৎ জীবনের সুদিন আরম্ভ হল তখন দুর্দিনের সমস্ত ঘটনাগুলি তাঁর স্মৃতির জগৎ থেকে সম্পূর্ণ মুছে গিয়েছিল। দুর্দিনে কমরেড বীরেন দত্তের অনুভূতি একরকম ছিল কিন্তু জীবনের সুদিন আসার পর তার চিন্তাচেতনা ও অনুভূতি সম্পূর্ণ পাল্টে গিয়েছিল। ইহা তথ্য ও ঘটনা দিয়ে পরবর্তী সময়ে সম্ভব হলে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

প্রয়াত গৌরাঙ্গ দেববর্মাদের বাড়িতে পার্টি ক্লাশ চলাকালীন কর্মীদের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। কম হওয়ার কারণ ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারী পার্টি কর্মীদের সঠিক সংখ্যা বলা কঠিন। তবে কমরেড দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত, কমরেড রেনু সেনগুপ্ত, কমরেড অপূর্ব রায়, কমরেড শক্তিপদ চক্রবর্তী, প্রয়াত গৌরাঙ্গ দেববর্মা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। কমরেড মহেন্দ্র

দেববর্মা উপস্থিত ছিলেন কিনা আমার সঠিক মনে নেই। প্রাক্তন কমরেড নিমাই দেববর্মা সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করেছি। তিনি বোনের বিবাহ দিতে হবে বলে পার্টির সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে রাজ্য সরকারের Food & Civil Supply Departmant এ Inspector-এর চাকুরী গ্রহন করেছিলেন, তবে আরও কয়েকজন পার্টি কর্মী ঐ পার্টি ক্লাসে যোগদান করেছিল বলে আমার মনে হয়, কিন্তু তাঁদের নাম আমার মনে নেই। কমরেড বঙ্কিম চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন বলে আমার মনে হচ্ছে না। কমরেড দ্বিজু আচার্যও তখন ছিলেন না। আমি নিজে বরাবর উপস্থিত ছিলাম।

পার্টি ক্লাশ সমাপ্ত হওয়ার পর আমাকে সম্পাদক করে ত্রিপুরা রাজ্য ইউনিটের একটি Under ground সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়েছিল। পার্টি কংগ্রেসের গৃহীত বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত রূপায়নের জন্য আমার ও কমঃ বীরেন দত্তের আত্মগোপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। পার্টি ক্লাশে অংশ-গ্রহণকারী প্রায় কর্মীরাই সাংগঠনিক কমিটির সদস্য ছিলেন। তবে কে কিভাবে দায়িত্ব পালন করবে পার্টি মিটিং-এ মোটামুটিভাবে ঠিক করা হয়েছিল। গ্রাম ও শহরের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করার দায়িত্ব প্রয়াত গৌরাঙ্গ দেববর্মার উপর দেওয়া হয়েছিল। যোগাযোগের কেন্দ্রস্থল করার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছিল।

পার্টির গৃহীত সিদ্ধান্ত মতো আমি ও কমঃ বীরেন দত্ত আত্মগোপন করার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। ত্রিপুরা রাজ্য তখনও কার্যতঃ ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করে নাই। রিজেন্ট মাতা মহারাণী প্রয়াত কাঞ্চনপ্রভা দেবী নামে মাত্র প্রশাসনের মূল শাসক ছিলেন। আমলা প্রধান I. C S অফিসার দেওয়ান A. B. Chatterjee ত্রিপুরার প্রশাসনের মূলতঃ হর্তাকর্তা ছিলেন। ভারতের কংগ্রেস পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার সারা ভারতে কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষনা করে P. D. Act চালু করেছিল, দেওয়ান A B. Chatterjee ত্রিপুরাতে তা সম্প্রসারণ (Extention) করালেন। আমাদের পার্টি ক্লাসের মিটিং-এ প্রাথমিকভাবে P D Act চালুর বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান চালানোর সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রজামণ্ডল কমিটিকেও এই সিদ্ধান্ত গ্রহন করানো হয়েছিল। প্রজামণ্ডলের মূল দাবী ছিল প্রজাস্বত্ব নিরূপন করে প্রজার ভোটে মন্ত্রী পরিষদ গঠন করা। অর্থাৎ রাজ্যে দায়িত্বশীল সরকার প্রবর্তন করা।

প্রজামণ্ডলের নেতৃত্বে ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এক সঙ্গে প্রোগ্রাম করে প্রচার অভিযানে বের হয়েছিল, এই প্রোগ্রাম কার্যকরী করতে গিয়ে প্রয়াত প্রভাত রায় ও প্রয়াত বংশীঠাকুর ও কমরেড দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত এবং কমরেড বীরচন্দ্র দেববর্মা মফস্বলে গিয়েছিলেন। আগরতলায় ফিরে এসে কমঃ দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত প্রয়াত প্রভাত রায় ও বংশীঠাকুর গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। কমরেড দশরথ দেব তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ এবং 'ল' এক সঙ্গেই পড়তেন, কিন্তু গ্রীষ্মের বন্ধের সময় বাড়ীতে এলে আমি ও কমঃ দশরথ দেব P. D. Act

এর বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করার জন্য প্রোগ্রাম গ্রহণ করেছিলাম। তিনি সদর উত্তর থেকে বিলোনিয়া পর্যন্ত প্রচার অভিযান চালান। কলকাতা পার্টি কংগ্রেসে যাওয়ার সময় কমঃ দশরথও তখন কলকাতায় ছিলেন। তখনই আমরা দুইজন একসঙ্গে বসে আন্দোলনের প্রোগ্রাম মোটামুটি ঠিক করেছিলাম। তিনিও কলকাতা থেকে এসেই খোয়াই, কমলপুর ইত্যাদি এলাকা পরিক্রমা করে P D. Act এর বিরুদ্ধে এবং প্রজামণ্ডলের মূলদাবীর উপর প্রচার অভিযান চালিয়েছিলেন, আমিও সদর দক্ষিণ থেকে বিলোনিয়া পর্যন্ত অনুরূপ প্রচার অভিযান চালিয়েছিলাম। রাজ্য সরকারের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আমাদের, বিরুদ্ধে বের হবে ইহা আমরা উভয়েই নিশ্চিত ছিলাম, কমঃ দশরথ দেব গ্রাম থেকে আর শহরে আসে নি, বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে প্রচার অভিযান করে এসে আমি আগরতলায় পর্যবেক্ষন করছিলাম। কমরেড সুধন্যা ও প্রয়াত হেমন্ত দেববর্মার জনশিক্ষার প্রচার অভিযানে অমরপুর যাওয়ার প্রোগ্রাম ছিল। তখন জৈষ্ঠ্যমাস, স্কুল বন্ধ। প্রয়াত হেমন্ত দেববর্মা চাকুরীরত অবস্থাতেও অমরপুরে যাওয়ার জন্য কমরেড সুধন্যা দেববর্মার বাড়িতে গিয়েছিলেন। কিন্তু কমরেড সুধন্যা দেববর্মা অতি সচেতন ব্যক্তি। তাই অবস্থার বিচার বিবেচনায় ঐ প্রোগ্রাম কার্যকরী করেন নাই। প্রয়াত হেমন্ত দেববর্মাকে সুতারমুড়ায় কমরেড সুধন্যা দেববর্মার বাড়ীতে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে অগত্যা বাড়ীতে ফিরে আসতে হয়েছিল।

আমি আগরতলায় অতি গোপনসূত্র থেকে কখন কার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের হবে অথবা কোনদিন কাকে গ্রেপ্তার করবে ইত্যাদি খবর রেখেছিলাম। কমরেড বীরেন দত্ত ও আমাকে যে গ্রেপ্তার করবে ইহা একরকম অবধারিত ছিল। আই বি. রা আমাদের পেছনে বরাবর লেগেই ছিল।

একদিন গোপন সূত্র থেকে জানতে পেরেছিলাম পরের দিন ভোর রাত্রে কমরেড বীরেন দত্তকে গ্রেপ্তার করা হবে। কমরেড বীরেন দত্তকে তৎমুহূর্তেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পার্টির সিদ্ধান্ত মতো কমরেড বীরেন দত্তের আত্মগোপন করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। ঐদিন রাত্রেই তাকে আত্মগোপন করতে হবে। তিনি ঐদিন রাত্রে আত্মগোপন করার জন্য পূর্ব নির্ধারিত স্থানে পৌঁছিয়ে দেবার নির্ভরযোগ্য কাকেও রাজী করাতে পারেন নি। আমার রাজনৈতিক গুরু কমরেড বীরেন দত্তকে যদি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করা হয় ঐদিন অন্ধকারময় গভীর রাত্রে অরুন্ধতী নগরে চারপাড়ার পাল বাড়িতে তাঁকে পৌঁছিয়ে দেবার জন্য তিনি শেষ পর্যন্ত কাকে সহায়ক হিসাবে রাজী করাতে পেরেছিলেন? পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হওয়ার পর কমরেড বীরেন দত্তের অনুগামীরা যারা সুদিনে তার পিছনে পিছনে জনযুদ্ধ নামক পত্রিকাটি বগলে চেপে দল বেধে ছুটত পুস্তিকায় উল্লেখিত তথাকথিত বিপ্লবী কমরেডরা সময় বুঝে বুদ্ধিমানের মত পার্টির সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি তাদের কাহাকেও আগরতলা শহর থেকে চারপাড়া যাওয়ার জন্য রাজী করাতে পারেন নি। আগরতলা শহর থেকে চারি-

পাড়া রাস্তা সম্পূর্ণ জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। তাও আবার সোজা রাস্তা ধরে যাওয়ার উপায় ছিল না। কারণ I. B.-দের নজর এড়িয়ে যেতে হবে। শেষ পর্যন্ত প্রয়াত গৌরাঙ্গ দেববর্মাই অন্ধকারময় অমাবস্যার গভীর রাত্রে কমরেড বীরেন দত্তকে চারিপাড়ার পাল বাড়িতে পেঁছিয়ে দিয়ে আবার একাকী ফিরে এসেছিলেন। আমাকেও পরের দিন তিনিই পাল বাড়িতে গভীর রাত্রে পেঁছিয়ে দিয়েছিলেন।

অথচ কমরেড বীরেন দত্তের পুস্তিকায় প্রয়াত গৌরাঙ্গ দেববর্মার সাহসিকতা ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কথা স্বীকৃতি পর্যন্ত নাই। প্রয়াত গৌরাঙ্গ দেববর্মা আজীবন বামফ্রন্টের সমর্থক ছিলেন। তিনি stroke-এ আক্রান্ত হয়ে Paralised অবস্থায় দীর্ঘদিন বিছানায় শয্যাশায়ী ছিলেন। কমঃ বীরেন দত্তের অতি দুর্দিনের সময় প্রয়াত গৌরাঙ্গ দেববর্মা অত্যন্ত সহায়ক কর্মী ছিলেন। কিন্তু অতি দুর্ভাগ্য কমরেড বীরেন দত্ত সুদিনের সময় (অর্থাৎ মন্ত্রীত্ব থাকাকালীন) একটা দিনও তাকে বাড়িতে এসে দেখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নি। কমরেড বীরেন দত্তের লিখিত স্মৃতিচারণ পুস্তিকায় প্রয়াত গৌরাঙ্গ দেববর্মার নাম উল্লেখিত হয়েছে বটে ইহাও কথাপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তার অবদানের কথা ভুলেও তিনি উল্লেখ করেননি। অথচ তথাকথিত সুদিনের বিপ্লবী কমরেডদের নাম অপ্রাসঙ্গিকভাবে বার বার উল্লেখ করেছেন। অপ্রাসঙ্গিক হলেও দুর্ভাগ্যের সহিত লিখতে হচ্ছে কমরেড বীরেন দত্তের লিখিত পুস্তিকায় উল্লেখ আছে তার সহোদরেরা নাকি প্রায় সবাই বিপ্লবী। বৃটিশ আমলে অনুশীলন পার্টি করার সময় হয়ত কমরেড বীরেন দত্তের কোন কোন ভাই সন্দেহভাজন হিসাবে গ্রেপ্তার বরণ করে বৃটিশ জেলে আটক থাকতে পারেন কিন্তু ১৯৪৮ সনে পার্টি বে-আইনি ঘোষিত হওয়ার পর কমরেড বীরেন দত্তের সহোদরদের কোন রকম বৈপ্লবিক ভূমিকা লক্ষ্য করি নাই। বরং বিপরীত ভূমিকাই লক্ষ্য করেছিলাম। কমরেড বীরেন দত্তের অতি দুর্দিনের সময় পুস্তিকায় লিখিত তথাকথিত বিপ্লবী সহোদরেরা কেহই সাহস করে তার স্ত্রী কমরেড সরুজু দত্তকে বাড়িতে আশ্রয় পর্যন্ত দেয় নি। কমরেড বীরেন দত্তের সহোদরদের বিপ্লবী মনোবৃত্তির কথা বাদ দিলেও যদি মানবতার খাতিরে বাড়িতে শুধু থাকার আশ্রয়টুকু দিতেন তাহলে শিশুকোলে কমরেড সরুজু দত্তকে পাহাড়ের গ্রামাঞ্চলে এত বিড়ম্বনা পেতে হতনা। ভদ্রমহিলাকে গ্রামে-গ্রামে ঘুরে চোখের জল ও নাকের জল ফেলতে হয়েছিল। অবশ্য আমি যদি ঐ সময় গ্রেপ্তার না হতাম এই অবস্থা হত না। উৎপীড়নকারীদের কাহাকেও এলাকার জনসাধারণ ক্ষমা করে নাই। তাদের সকলকেই অকাল মৃত্যু বরণ করতে হয়েছিল।

যারা শিশুকালে বিপদাপন্ন মহিলার প্রতি বিন্দুমাত্রও সহানুভূতি প্রকাশ করেনি—কমরেড বীরেন দত্তের সেই সহোদরেরা কি করে বিপ্লবী হলেন? ইহাই কমরেড বীরেন দত্তের প্রতি আমার জিজ্ঞাসা।

কমরেড বীরেন দত্তের লিখিত পুস্তিকায় উল্লেখিত বিষয়গুলি পর্যালোচনা

করতে গিয়ে আমাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘটনাপ্রবাহের বাস্তবতাগুলি আলোচনা করতে হয়েছে। কাকেও হেয় করা কিংবা আঘাত দেওয়া আমার মূল উদ্দেশ্য নহে। কমরেড বীরেন দত্তের অতিরঞ্জিত ও বাড়তি কথা এবং বাস্তব ঘটনাগুলি এড়িয়ে যাওয়ার মনোবৃত্তি কিংবা অস্বীকৃতির প্রতিবাদ হিসেবে প্রসঙ্গত অপ্রিয় সত্য ঘটনাগুলি আলোচনা করতে বাধ্য হয়েছি। ইহার জন্য আমি খুবই দুঃখিত।

আত্মগোপনের প্রাথমিক স্তর

চারিপাড়ার পাল বাড়িতে মাত্র একরাত্রি কাটিয়েই পরের দিন ভোরে কমরেড বীরেন দত্ত ও আমি সদর দক্ষিণ বিশালগড় রাস্তা ধরে প্রথমে হাঁটতে আরম্ভ করেছিলাম। হাতিরলেগা বর্তমান ঈশান চন্দ্র নগর তহশীল পর্যন্ত গিয়েই পূর্বদিকে গ্রামের দুই পায়ে রাস্তা দিয়ে আমার গ্রামের দিকে রওনা হয়েছিলাম। দুপুরেই আমার গ্রাম লাটিয়াছড়াতে পৌঁছে আমার নিজ বাড়ীতে খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম। আমার বাড়ীতে বেশীদিন থাকা নিরাপদ বোধ করি নাই। তাই বিশ্রামগঞ্জ এলাকার ঘেংরা বাড়ীতে জনশিক্ষা সমিতির একজন বিশিষ্ট কর্মী প্রয়াত যতীন্দ্র দেববর্মার বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। এবং ঐ গ্রামের নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে ঘরোয়া মিটিং ডেকে P D Act এর বিরুদ্ধে রাজ্য প্রজামণ্ডলের দায়িত্বশীল সরকার প্রবর্তনের দাবী ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছিল। আত্মগোপন করার পূর্বে আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রাম ছিল না। অর্থাৎ Where to begin, How to begin ইত্যাদি কিছুই আমাদের সুনির্দিষ্ট ছিল না। কোথাও এক জায়গায় আমাদের বেশীদিন থাকার অবস্থাও ছিল না। প্রয়োজনও ছিল না।

কমরেড বীরেন দত্ত ও আমি গ্রামে ঢুকবার আগে ত্রিপুরার উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে কমিউনিস্ট পার্টির কোন সংগঠন ছিল না। কমঃ বীরেন দত্তের ব্যক্তিগত প্রভাবিত কিংবা পরিচিত বলেও কোথাও কেউ ছিল না। তবে জনশিক্ষা সমিতির কমিটি ও কর্মী প্রায় সব গ্রামেই ছিল। ইহাই আমাদের একমাত্র ভিত্তি ছিল। আমি ও কমরেড বীরেন দত্ত ইহাকে ভিত্তি করেই গ্রামের পর গ্রাম পরিক্রমা করে ঘরোয়া বৈঠক ইত্যাদি করেছিলাম। এবং জনশিক্ষা সমিতির সক্রিয় কর্মীদের এ রাজ্যে দায়িত্বশীল সরকার প্রবর্তনের আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলাম। ইতিমধ্যে বেশ কিছু কর্মী আমরা প্রাথমিক স্তরে সংগ্রহও করতে পেরেছিলাম। যথা টাকারজলার উদয়জমাদার পাড়ার প্রয়াত ভৈরব দেববর্মা, আমতলীর কমরেড অখিল দেববর্মা, পশ্চিম টাকারজলার নারায়ণ, খামারপাড়ার প্রয়াত রাজেন্দ্র দেববর্মা প্রমুখ। আত্মগোপন করার প্রাথমিক স্তরে আমাদের অবস্থাও কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। কমরেড বীরেন দত্তের একটি ধুতি, একটি গেঞ্জি, একটি গামছা ও একটি জামাই সম্বল ছিল। আমার নিজেরও ঐ একই অবস্থা। ছাতা কিংবা একটি ব্যাগও আমাদের ছিল না। বৃষ্টির সময় এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যেতে আমাদের ভীষণ অসুবিধা

হত। একজন প্রাক্তন সৈনিক আমাদের শোচনীয় অবস্থা দেখে আমাদেরকে একটা রেইনকোট দিয়েছিল। ঝড় বৃষ্টির সময় আমাদেরকে একসঙ্গে রেইন কোট গায়ে দিয়ে আলের রাস্তা দিয়ে চলতে হয়েছিল। এই সমস্ত কারণে তার শরীর ক্রমশঃ ভাঙ্গতে থাকে।

আন্দোলনের প্রাথমিক স্তরে কমরেড বীরেন দত্তের বক্তব্য

কমরেড বীরেন দত্ত সুচতুর ব্যক্তি। তিনি রাতারাতি উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে তার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তৎকালীন এ রাজ্যের বাঙালীদের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে সমালোচনা করে উপজাতিদের জাতীয় সেণ্টিমেণ্টকে জাগিয়ে তোলার প্রয়াসী হয়েছিলেন। কমঃ বীরেন দত্তের মূল বক্তব্য হচ্ছে এ রাজ্যের উপজাতিরা বাঙ্গালীদের বেগুনের ক্ষেত। রাত দুপুরেও বাগানের বেগুন পেড়ে এনে তরকারী রান্না করে খাওযা যায। কোন কষ্ট হয় না। কমরেড বীরেন দত্তের মূল বক্তব্য ছিল এ রাজ্যের তৎকালীন বাঙ্গালী মাত্রই শোষক। আর উপজাতিরা হচ্ছে শোষিত। রাজার আমলে রাজ্য সরকারের বাঙ্গালী হিন্দু আমলারা রাজাদের আনুকূল্যে উপজাতিদের উপর বিভিন্ন উপায়ে অবাধে শোষণ চালাত। রাজ্যব্যাপী বাঙ্গালী হিন্দু ব্যবসায়ীরা ও সর্বনাশী দাদনের মারফত উপজাতিদের লাগামহীন শোষণ চালাত। তদুপরি কুলপুরোহিত ও কুলগুরুরা (গোস্বামীরা) রাজাদের সনদপ্রাপ্ত বা রাজাদের আনুকূল্যে উপজাতিদের সরলতা অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতার সুযোগে নির্মমভাবে শোষণ চালাত। সামন্ততান্ত্রিক আমলে জনশিক্ষা সমিতির আগমুহূর্ত পর্যন্ত রাজ্যের কোন উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় কোন প্রাথমিক স্কুল পর্যন্ত ছিল না। অথচ অউপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় প্রত্যেকটি শহর ও বাজারগুলিতে প্রাথমিক স্কুল থেকে হাই স্কুল পর্যন্ত ছিল। রাজার আমলে বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে শ্রমজীবী কিংবা কৃষকশ্রেণী উপজাতি গ্রাম যা আশেপাশে ছিল না বললেই চলে। তৎসময়ে এ রাজ্যের বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে অধিকাংশই হয় রাজ্য সরকারের আমলা অথবা ব্যবসায়ী মহাজন ছিলেন। কমঃ বীরেন দত্ত মিটিংগুলিতে অতি সুন্দরভাবে তৎকালীন বাস্তব ঘটনাগুলি তুলে ধরতেন। কমরেড বীরেন দত্তের বক্তব্যগুলি বাস্তবতার সহিত সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। তিনি বলতেন "যেহেতু আমি বাঙালী হয়ে তাঁদের (বাঙ্গালী হিন্দুদের) বিভিন্ন ধরনের জেহাদ ঘোষণা করেছি বলেই কোন বাঙালী আমাকে ভাল চোখে দেখেন না। এমন কি আমার ভাইয়েরা পর্যন্ত এ কারণে আমাকে বাড়ীতে স্থান দেয় না" ইত্যাদি। ত্রিপুরার গণআন্দোলনের প্রাথমিক স্তরে ইহাই প্রচার বা Agitation-এর মূল ভিত্তি ছিল। ইহা অস্বীকার করার কোন কারণ নেই কমরেড বীরেন দত্ত তৎকালীন উপজাতির বাস্তব অবস্থার বিচার বিশ্লেষণ করে বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে যে বক্তব্য রেখেছিলেন—তাতে উপজাতি জনসাধারণ দারুণভাবে আলোড়িত হয়েছিল। উপজাতিদের মনে বাঙ্গালী বিদ্বেষী

মনোভাব দানা বেঁধে উঠেছিল। রাজনীতিজ্ঞ কমরেড বীরেন দত্ত সস্তায় বাজীমাৎ করে উপজাতি জনতার মধ্যে উপজাতিদের একান্ত দরদী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। উপজাতি জনতা তখন বীরেন দত্ত বলতে রীতিমতো অজ্ঞান হয়ে উঠেছিল।

অপরদিকে রাজ্য সরকারও এই আন্দোলনকে প্রাথমিক স্তরেই "বাংগাল খেদা" নাম দিয়ে দমন পীড়নের মাধ্যমে আন্দোলন অংকুরেই ধ্বংস করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু সচেতন উপজাতি শিক্ষিত যুবকেরা অত্যন্ত ধৈর্য ও সহনশীলতার মাধ্যমে পরবর্তী সময়ে এই উগ্রজাতীয়তাবাদ সাম্প্রদায়িক উত্তেজনামূলক আন্দোলনের মূল ধারাকে যথা সময়ে গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তনের দাবীর আন্দোলনে প্রবাহিত করেছিল। ত্রিপুরার গণ আন্দোলনের প্রাথমিক স্তরে কমরেড বীরেন দত্ত এ রাজ্যের উপজাতি জনগোষ্ঠীর একান্ত দরদীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু প্রথম সাধারন নির্বাচনে তিনি যখন লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হলেন অর্থাৎ জীবনে সুদিন আরম্ভ হওয়ার পর তার চিন্তা সম্পূর্ণ পাল্টে গিয়েছিল, তিনি তখন রীতিমত বাঙ্গালী জাতীয়তা ভাবধারায় সম্পূর্ণ আকৃষ্ট ও প্রভাবিত হয়েছিলেন। কমরেড বীরেন দত্ত এ রাজ্যের অনুন্নত, পশ্চাৎপদ, চিন্তা চেতনা ও বুদ্ধি বিবেচনায় অনগ্রসর পার্বত্য উপজাতি জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নে সম্পূর্ণ বিপরীত মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন। যে ব্যক্তি উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ত্রিপুরার রাজনৈতিক নেতা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল—জীবনে সুদিন আসার পর সেই কমরেড বীরেন দত্ত এ রাজ্যের অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ উপজাতিদের জাতীয় জীবনের অস্তিত্ব রক্ষার কথা বেমালুম ভুলে গেলেন। এ রাজ্যে অর্ধেক সংখ্যক উদ্বাস্তু গ্রহন করার অর্থই হচ্ছে অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ উপজাতি জনগোষ্ঠীর সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়ে জাতীয় জীবনের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়া। ইহা কমরেড বীরেন দত্তের মত অভিজ্ঞ রাজনৈতিক নেতার অজানা ছিল না। অথচ প্রত্যেকবার লোকসভা নির্বাচনে নির্বাচিত হওয়ার সময় তিনি বরাবর উপজাতিদের ভোট একচেটিয়াভাবে পেয়েছেন। অ-উপজাতিদের ভোট তিনি বরাবর কমই পেয়েছেন।

তা সত্বেও কমরেড বীরেন দত্তের জীবনে সুদিন আসার পর তিনি এ রাজ্যের উপজাতি জনগোষ্ঠীর সর্বনাশ সাধনের জন্য সচেতনভাবে মারমুখী হয়ে উঠেছিলেন। এ রাজ্যে অধিক উদ্বাস্তু গ্রহণ করার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার যখন দ্বিধাগ্রস্থ (গোবিন্দ বল্লভ পন্থ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী থাকাকালীন) তখন কমঃ বীরেন দত্তই ত্রিপুরার বড় আমলাদের যোগসাজসে এরাজ্যে প্রাক্তন মহারাজা বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুরের ঘোষিত ট্রাইবেল রিজার্ভ এলাকাতে কোথায় কত দ্রোন বাড়তি অনাবাদী পতিত জমি আছে সে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে লোকসভায় প্রশ্নাকারে নাকি উপস্থাপিত করেছিলেন। তৎসময়ে ত্রিপুরায় সাড়ে চারলক্ষ উদ্বাস্তু ত্রিপুরার বিভিন্ন ট্র্যানজিট ক্যাম্পে পুনর্বাসনের অপেক্ষমান ছিল। কমরেড

বীরেন দত্তের বক্তব্য নাকি ছিল-"ত্রিপুরায় হাজার হাজার একর জমি অনাবাদী ও পতিত পরে আছে, উপজাতিদের বংশধর কবে বৃদ্ধি পাবে তার জন্য ট্রাইবেল রিজার্ভ ঘোষনা করে সংরক্ষিত রাখা হয়েছে", তৎকালীন ঐ ট্র্যানজিট ক্যাম্পে অবস্থানরত সাড়ে চারলক্ষ উদ্বাস্তুদের সম্যক পুনর্বাসন দিয়ে আরও কযেক লক্ষ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দিলেও নাকি সেই পতিত অনাবাদী জায়গা থেকে যাবে ইত্যাদি (কমঃ দশরথের বাচনিক থেকে সংগৃহীত), রাজ্যের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের মধ্যে কমরেড বীরেন দত্তই অত্যন্ত মারমুখীভাবে উপজাতি রিজার্ভ ভেঙ্গে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য আন্দোলন সংগঠিত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে বিরোধিতা করেছিলাম। কিন্তু কমরেড দশরথ দেবের দুর্বলতার জন্য কমরেড বীরেন দত্তের প্রস্তাব রাজ্য কমিটিতে গৃহীত হয়েছিল। ট্রাইবেল রিজার্ভ ভেঙে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য কমিউনিস্ট পার্টিকে আন্দোলনও করতে হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে পরবর্তী সময়ে সম্ভব হলে তথ্য ও ঘটনা দিয়ে বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করব। গ্রাম পরিক্রমা করার সময় কমরেড বীরেন দত্তকে নিয়ে আমাকে ক্রমশই বিব্রত হতে হয়েছিল, কারন উপজাতিদের খাওয়ার ব্যবস্থাপনা কমরেড বীরেন দত্তের পেটে সহ্য হত না। অথচ তিনি বাহাদুরি করে সর্বত্রই বলতেন 'খাওয়ার ব্যাপারে কমরেড বীরেন দত্তের' কোন অসুবিধা নেই ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেল কমরেড বীরেন দত্তের পেটে সহ্য হচ্ছে না। কিন্তু তিনি কোন সাবধানতা অবলম্বন না করে যখন যা পান তাই খেতেন। তাতে পেটের পীড়া ক্রমশঃ বাড়তে থাকে তদুপরি ঘনঘন ম্যালেরিয়া জ্বর লেগেই ছিল। সালফাগুয়াডিন ও কুইনাইন ট্যাবলেট দিয়ে জ্বর ও পেটের পীড়া নিরাময় করা যাচ্ছিল না। ক্রমবর্ধমান জ্বর ও পেটের পীড়ায় কমরেড বীরেন দত্ত শারিরীক ও মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়তে থাকেন। তবে মুখে কিছুই বলতেন না। আমি নিজেও রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। ভাল ডাক্তার দেখিয়ে ভাল করে চিকিৎসা করানোর উপায়ও ছিল না। এইভাবে আরও কিছুদিন চলতে থাকলে কমরেড বীরেন দত্তকে বাঁচিয়ে রাখাই রীতিমত কঠিন হত।

তাই তার শ্বশুর বাড়ী সদর উত্তর এলাকায় সিধাই মোহনপুর থানা অন্তর্গত কাতলামারা বাজারের কাছে দলপতী উপজাতি গ্রামের অতি নিকটবর্তী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান অধুনা বাংলাদেশে অবস্থিত গ্রামে চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য আমাদের দুইজনকেই সদর উত্তরে চলে আসতে হয়েছিল। আমাদের সঙ্গে ছিলেন টাকারজলার উদয় জমাদার পাড়ার প্রয়াত ভৈরব দেববর্মা। ইতিমধ্যে কমরেড দশরথ দেবের বিরুদ্ধেও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের হয়েছিল। তিনিও খোয়াই বিভাগ থেকে বড়মুড়া অতিক্রম করে দলবল সহ আমাদের সহিত যোগাযোগ করার জন্য সদর উত্তরে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। আমরা রাজঘাটে একত্রে মিলিত হয়েছিলাম, যথাসময়ে ১৯৪৮ সনে জৈষ্ঠমাসের শেষদিকে আমার

মতে লেফুংগা স্কুলে, কমরেড দশরথের মতে রাজঘাট গ্রামে একত্র হয়ে তৎকালীন রাজ্যের রাজনৈতিক অবস্থা ও আমাদের আন্দোলনের পর্যালোচনা করে ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত করেছিলাম।

কমিটির সভাপতি কমরেড দশরথ দেব ও সাধারন সম্পাদক হিসাবে আমাকে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত করা হয়েছিল। গণমুক্তি পরিষদ গঠিত হওয়ার পর কার্যতঃ রাজ্য প্রজামণ্ডল ও জনশিক্ষা সমিতির কোন ভূমিকা থাকল না। মুক্তি পরিষদের নামেই আন্দোলন সংগঠিত করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। উক্ত মিটিং-এ আমি ও কমরেড দশরথ দেব বাদে উল্লেখযোগ্য কর্মীদের মধ্যে কমরেড বগলা দেববর্মা, কমরেড বীরেন দত্ত, প্রয়াত ভৈরব দেববর্মা ও খোয়াই বিভাগের কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মী উপস্থিত ছিলেন। কমরেড সুধন্যা দেববর্মা ও প্রয়াত হেমন্ত দেববর্মা তখন পর্যন্ত চাকুরীরত ছিলেন। আত্মগোপনও করেন নাই। কাজেই কমিটিতে নাম রাখার কোন প্রশ্নও ছিল না। মিটিং-এ নবগঠিত মুক্তি পরিষদের নামে আন্দোলনের মূল দাবী দাওয়ার উপর ভিত্তি করে একটি বিজ্ঞপ্তি ছাপানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। আগরতলার কোন প্রেসেই আমাদের বিজ্ঞাপন ছাপানো সম্ভব ছিল না।

আমাদের আত্মগোপন করে আন্দোলন করার সময় বরাবর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হত। মনে রাখা দরকার পাকিস্তান জন্মলগ্ন থেকেই ভারতের শত্রু ছিল। আমাদের আন্দোলনের ব্যাপারে তাদের কোন মাথা ব্যথা ছিল না। কাজেই আমাদের পক্ষে কেহ বিজ্ঞাপন ছাপাতে গেলে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ কিংবা জনসাধারন কেহই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করত না। অবশ্য পাশপোর্ট প্রথা তখনও চালু হয়নি। এ রাজ্যের উপজাতিরা অনায়াসে পাকিস্তানে যাতায়াত করতে পারত। কমরেড বীরেন দত্ত চিকিৎসার প্রয়োজনে তৎকালীন পাকিস্তানে শ্বশুরবাড়ীতে যাচ্ছেন, তিনিই বিজ্ঞাপন ছাপানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন। কমরেড বীরেন দত্তকে শ্বশুরবাড়ীতে পৌঁছিয়ে দেওয়া ও বিজ্ঞাপন ছাপানোর টাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছিল। বিজ্ঞাপন ছাপানোর দায়িত্ব তিনি অবশ্যই পালন করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে আমাদের স্থানীয় কর্মীদের মারফত খবর জানতে পেরেছিলাম কমঃ বীরেন দত্ত স্বেচ্ছায় পাকিস্তান সীমান্ত অতিক্রম করে ত্রিপুরার কাছে এসে গ্রেপ্তার বরন করেছেন। ত্রিপুরার পুলিশ নাকি লোক পাঠিয়ে কমরেড বীরেন দত্তকে সীমান্তের এপারে ডাকিয়ে এনে গ্রেপ্তার করেছিল। কারন ত্রিপুরার পুলিশের পক্ষে পাকিস্তানে গিয়ে কমরেড বীরেন দত্তকে গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা ছিল না। পাকিস্তান পুলিশেরও এত মাথা ব্যথা ছিল না, কমরেড বীরেন দত্তকে গ্রেপ্তার করে ত্রিপুরার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া। তিনি একজন সচেতন নেতৃস্থানীয় পার্টি-কর্মী। গ্রেপ্তারী পারোয়ানা থাকা অবস্থাতে একজন অপরিচিত ব্যক্তির ডাকে কোন রকম চিন্তাভাবনা না করে সরাসরি সীমান্ত অতিক্রম করে আসতে পারেন ?

তাছাড়া গ্রেপ্তারী পরোয়ানা থাকা অবস্থাতে তিনি কি করে শ্বশুরবাড়ীতে নিশ্চন্তে অবস্থান করতে পারেন ? তিনি ইচ্ছা করলে তার শ্বশুরবাড়ীর অতি নিকটেই দলদলি পাড়াতে আমাদের নির্ভরযোগ্য কর্মী ছিল, তাদের সহযোগিতায আত্মগোপন করে থাকার জায়গার অভাব ছিল না। অথবা শ্বশুরবাড়ীর আশে-পাশেই কাহারও বাড়ীতে আত্মগোপন করে থাকতে পারতেন। কাজেই ঘটনা প্রবাহের বাস্তবতা বিচার বিশ্লেষণ করলে ইহাই অনুমিত হয় তিনি শারিবরীক ও রাজনৈতিক কারনে স্বেচ্ছাপ্রনোদিত হয়েই গ্রেপ্তার বরণ করেছেন।

কমরেড বীরেন দত্তের গ্রেপ্তারের পরবর্তী অধ্যায়

কমরেড বীরেন দত্ত গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ার পর আমি ব্যক্তিগতভাবে জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলাম, একদিকে সদ্য গঠিত মুক্তি পরিষদের নেতৃত্বের জাতীয়তাবাদী চিন্তা চেতনা এবং অন্ধ কমিউনিস্ট আতংক অন্যদিকে তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির সশস্ত্র বিপ্লবের কর্মসূচী—এই দুইটি রাজনৈতিক লাইনকে সমন্বয়সাধন করা যে কত জটিল কাজ ইহা আমি, ভুক্তভোগী ছাড়া কেহই কল্পনা করতে পাববে না। কমরেড বীরেন দত্ত শ্বশুর বাড়ীতে যাওয়ার পূর্বে আমাকে Unexposed কমিউনিস্ট কর্মী হিসেবে কাজ করার পরামর্শই দিয়ে গিয়েছিলেন।

কারন কমিউনিস্ট কর্মী হিসেবে প্রকাশিত হলে সদ্য গঠিত মুক্তি পরিষদ কর্মীদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারত। আন্দোলনে সাধারন কর্মীদের টানা রীতিমত সমস্যা হয়ে দাঁড়াত। তৎসময়ে মুক্তি পরিষদের নেতৃত্বের একাংশের মধ্যে কমিউনিস্ট বিরোধী না হলেও কমিউনিস্ট আতংক প্রবল ছিল কমরেড বীরেন দত্ত গ্রেপ্তার বরন করার পর আমি ছাড়া কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব বা কর্মীদের মধ্যে কেহই আত্মগোপনকারী ছিলেন না। আমি ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি আমি ও কমরেড বীরেন দত্ত আত্মগোপন করার পূর্বে এ রাজ্যের উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় কমিউনিস্ট পার্টির কোন সংগঠন বা ইউনিট ছিল না। একমাত্র সুতারমুড়া গ্রামের প্রযাত সূর্যকুমার দেববর্মা আগরতলায় প্রয়াত বারীন চ্যাটার্জির কারখানায় চাকুরী করার সময় পার্টি সদস্যপদ গ্রহন করেছিলেন বলে জানতাম। পরবর্তী সময়ে এলাকাতে পার্টি সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপারে তার সক্রিয় ভূমিকা যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। আমি নিজেও পার্টির রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে সম্পূর্ণ নবাগত। অতীত রাজনৈতিক জীবনের কোন অভিজ্ঞতা আমার ছিল না, কমরেড বীরেন দত্তের গ্রেপ্তার হওয়া যেন আমাকে সমুদ্রের মধ্যে গলা ধাক্কা দিয়ে ফেলে যাওয়ার মত অবস্থা সৃষ্টি করেছিল। তবে আমার পুঁজি ছিল পার্টির প্রতি একান্ত আনুগত্য ও সাহসিকতা। আমার মূল লক্ষ্য ছিল মুক্তি পরিষদের জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় পরিচালিত আন্দোলনকে বাস্তব কর্মক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির বৈপ্লবিক কর্মসূচী মতে সংগ্রামের পথে এগিয়ে নেওয়া এবং

মুক্তি পরিষদ কর্মীদের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করাতে বাধ্য করা। আমি এখানে আমার সাফল্য সম্পর্কে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি না। কারন ঘটনা প্রবাহের বাস্তবতাই ইহার সাক্ষ্য হিসেবে বহন করবে।

কমরেড বীরেন দত্তের গ্রেপ্তারের পর আমি পূর্বনির্ধারিত মতো প্রয়াত গৌরাঙ্গ দেববর্মার মারফত আগরতলার পার্টি কর্মীদের সহিত যোগাযোগ করে আমার অধ্যুষিত এলাকায় কর্মীদের মিটিং আহ্বান করেছিলাম। আগরতলা শহরের নিকটবর্তী দক্ষিন আনন্দনগর রামগতি পাড়া পর্যন্ত এসে শহরের পার্টি কর্মীদের সহিত যোগাযোগ করে মিটিং আহ্বান করেছিলাম। প্রয়াত গৌরাঙ্গ দেববর্মা ও কমরেড আতিকুল ইসলাম গিয়েছিলেন। কমরেড বীরেন দত্তের গ্রেপ্তারের পর সুষ্ঠভাবে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেওয়ার প্রয়োজনে পার্টি কর্মীদের এক আলোচনা সভা আহ্বান করা একান্ত অপরিহার্য ছিল। কমরেড আতিকুল ইসলাম ও প্রয়াত গৌরাঙ্গ দেববর্মার সহিত আলোচনা করে গাবর্দি বাজারের পশ্চিম দিকে ওয়াখীরায় সর্দারের বাড়ীতে পার্টি কর্মীদের এক সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছিল। দক্ষিন আনন্দনগর রামগতি পাড়াতে কমরেড অপূর্ব রায়ও উপস্থিত ছিলেন। আগরতলা শহরের কমঃ আতিকুল ইসলাম, কমরেড বেনু সেনগুপ্ত, কমঃ অপূর্ব রায়, প্রয়াত গৌরাঙ্গ দেববর্মা প্রমুখ সেই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। এখানে উল্লেখ করা দরকার কমরেড দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত, প্রয়াত প্রভাত রায় ও প্রয়াত বংশী ঠাকুর, কমরেড বীরেন দত্তের আগেই গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। বিশ্রামগঞ্জ এলাকা থেকে জম্মেজয়নগর এলাকা পর্যন্ত সমগ্র এলাকার বিশিষ্ট কর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখযোগ্য বিশিষ্ট কর্মীদের মধ্যে প্রয়াত রাজেন্দ্র দেববর্মা, কমরেড অখিল দেববর্মা, প্রয়াত চন্দ্রশেখর দেববর্মা, কমলা দেববর্মা, প্রয়াত আনন্দ দেববর্মা, প্রেমচন্দ্র দেববর্মা, প্রয়াত মনীন্দ্র দেববর্মা ও আরও অন্যান্য কর্মী উপস্থিত ছিলেন। কমরেড সুরেন্দ্র দেববর্মাও উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে সাংগঠনিক কমিটি ভেঙ্গে রাজ্য কমিটি করা হয়েছিল। আমাকেই সর্বসম্মতিক্রমে সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়েছিল। আমাকে সর্বক্ষণ সাহায্য করার জন্য মণ্টু দাসগুপ্ত ও কলেজের ছাত্র কল্যান চক্রবর্তীকে আমার সহিত থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কমরেড দ্বিজু আচার্যকে জম্মেজয় নগর এলাকায় পার্টি কর্মীদের সাহায্য করার জন্য সর্বক্ষণ কর্মী হিসেবে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিশ্রামগঞ্জ এলাকায় তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আগত কমঃ সুনীল দাস ও কমঃ ইশাবলী মিঞাকে সর্বক্ষন থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। উভয়েই অনেকদিন বিশ্রামগঞ্জ এলাকায় আত্মগোপন করে কাটিয়ে গিয়েছেন। সম্মেলনে সদর দক্ষিণ আমার অধ্যুষিত এলাকাতে পার্টি সংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছিল।

পার্টি কেন্দ্রের সারকুলার, প্রচার পুস্তিকা, বিজ্ঞপ্তি ও পার্টির শিক্ষামূলক বই ইত্যাদি নিয়মিত পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমি ধৈর্য ও সহনশীলতার

সহিত আগরতলা শহরের পার্টি কর্মীদের সক্রিয় সহযোগিতায় প্রথমে আমার অধ্যুষিত এলাকায় সুনির্দিষ্ট কর্মীদের নিয়ে পার্টি সংগঠন গড়ে তুলেছিলাম। পরবর্তী সময়ে সি. পি. এম রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড ভানু ঘোষও যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। তিনি মাথায় কাপড় বেঁধে ফাড়ি রাস্তা দিয়ে বনজঙ্গল ভেঙ্গে ও বৃষ্টির মধ্যে নদী নালা ও ছড়া ইত্যাদি অতিক্রম করে আমার সহিত যোগাযোগ রক্ষা করতেন। আন্দোলনের গতি প্রকৃতির পর্যালোচনা ও পার্টি সংগঠনের ব্যাপারে আমাকে মূল্যবান পরামর্শ দিতেন। মাঝে মধ্যে কর্মীদের পার্টির আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে তোলার জন্য আলোচনা চক্রে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

কমরেড বীরেন দত্ত গ্রেপ্তার হয়ে যাবার পর তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির বিশিষ্ট কর্মী কমরেড নিমাই দেববর্মাকে সর্বক্ষণ কর্মী হিসেবে পাওয়ার জন্য আগরতলায় লোক পাঠিয়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য খবর পাঠিয়েছিলাম। তিনিও আমার খবর পেয়ে আমার গ্রাম পর্যন্ত গিয়েছিলেন। কিন্তু আমি গ্রামে ছিলাম না তাই সাক্ষাৎকার ঘটেনি। তিনি অপেক্ষা না করেই ফিরে এসেছিলেন। ইহার পর আর যোগাযোগ হয়নি।

মুক্তি পরিষদের বিভিন্ন কর্মী সম্মেলনে আমি বরাবর কমিউনিস্ট পার্টির প্রচার পুস্তিকা ও মার্কসীয় বই প্রচুর পরিমাণে কর্মীদের মধ্যে বিলি বন্টনের ব্যবস্থা করেছিলাম। ইহাতে খোয়াই বিভাগেব বিশিষ্ট কর্মীদের মধ্যে প্রয়াত রবীন্দ্র দেববর্মা, কমরেড রামচরন দেববর্মা ও অন্যান্য শিক্ষিত কর্মীরা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পার্টি সম্পর্কে জানবার জন্য আগ্রহশীল হয়ে উঠেছিলেন। অপরদিকে রাজ্য সরকার কমিউনিস্ট নিধন যজ্ঞের নাম মিলিটারী নামিয়ে উপজাতি গ্রামগুলিতে অস্বাভাবিক দমন, পীড়ন, গৃহদাহ থেকে আরম্ভ করে গ্রামে গ্রামে কংগ্রেসী দালালদের সাহায্যে লুটতরাজ ও নারী নির্যাতন পর্যন্ত আরম্ভ করেছিল। গ্রামের উপজাতিদের পথে, ঘাটে ও হাটে পাকড়াও করে কমিউনিস্ট বলে অমানুষিক লাঠিপেটা করে জেলখানাতে বিনা বিচারে মাসেব পর মাস আটকিয়ে রাখা হত। জেল হাজতে আটক বন্দীদেব পশুর মত ব্যবহার করা হত। কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে ত্রিপুরার উপজাতি জনগোষ্ঠী কিছুই জানত না। আন্দোলনের প্রাথমিক স্তরে কমিউনিস্ট পার্টির নাম পর্যন্ত অধিকাংশ জনসাধারণ জানত না। কিন্তু রাজ্য সরকাবের পুলিশ অফিসাররা কমিউনিস্ট আখ্যা দিযে সাধারণ মানুষের উপর লাগামহীন অত্যাচার ও উৎপীড়নের জন্য জনতার মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে জানবার আগ্রহ বেড়ে গিয়েছিল। ইহাতে কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পর্কে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করতে আমাদের সহায়ক হয়েছিল। গণমুক্তি পরিষদ কর্মীদের মধ্যেও কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে প্রচণ্ড আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল। অপরদিকে মুক্তি পরিষদ নেতৃত্বের প্রভাবশালী অংশ আন্দোলনের প্রাথমিক স্তর থেকেই "আমরা কমিউনিস্ট নহি" এই কথা বলে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নিকট গণস্বাক্ষর

সংগ্রহ করে দরখাস্ত পাঠাতে থাকেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। এমন কি ভারতের কোন সর্বভারতীয় জাতীয়তা পার্টি ও মুক্তি পরিষদের ত্রিপুরায় গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তনের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সমর্থন করতে এগিয়ে আসে নাই। সর্বভারতীয় পার্টির মধ্যে একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টিই মুক্তি পরিষদের এই আন্দোলনকে সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা করার জন্য এগিয়ে এসেছিল।

প্রসঙ্গত একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা বলতে হচ্ছে—অবশ্য বর্তমানে কেহই স্বীকার করবেন না। তথাপি তৎকালীন মুক্তি পরিষদ নেতৃত্বের একাংশের মানসিক প্রতিক্রিয়া কি ছিল ইহা আলোচনা করার জন্যই ঘটনাটি উল্লেখ করতে হচ্ছে। সন ও তারিখ সঠিকভাবে উল্লেখ করা সম্ভব নহে। একদিন কমরেড দশরথ দেব জরুরী মিটিং ডেকে আমাকে ডাকিয়ে এনেছিলেন। জরুরী মিটিং খুবই গোপনীয় ছিল। আমি, কমরেড দশরথ দেব, কমরেড সুধন্ব্যা ও প্রয়াত হেমন্ত দেববর্মা, এই চারিজন ছাড়া অন্য কেহ উপস্থিত ছিল না। মিটিং-এর আলোচ্য বিষয় ছিল আত্মসমর্পণ করা। প্রস্তাব এসেছিল প্রয়াত ওয়াঘীরায় ঠাকুরের মারফত। প্রয়াত ওয়াঘীরায় ঠাকুর রাজার আমলের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। প্রস্তাবটি ছিল তৎকালীন মুখ্যসচিব প্রয়াত রমেন্দ্র কিশোর দেববর্মা ভোর ৪টায় জিরানিয়ার নিকটে মাধববাড়ীতে তার গাড়ী পাঠাবেন। আমরা ৪জন ঐ গাড়ীতে করে তার বাড়ীতে যাব, বাকী কাজ তিনিই করবেন। প্রস্তাবটি শোনামাত্র আমি প্রত্যাখান করেছিলাম। কমরেড সুধন্ব্যা দেববর্মা ও প্রয়াত হেমন্ত দেববর্মা পক্ষে কিংবা বিপক্ষে কিছুই বলেন নি। আমি সোজা কথা বলেছিলাম তোমরা ইচ্ছে করলে যেতে পার কিন্তু আমার পক্ষে সম্ভব নহে। অবশেষে কমরেড দশরথ দেব আমার বক্তব্য শোনার পর এই বক্তব্য সম্পূর্ণ অবাস্তব বলে অগ্রাহ্য করেছিলেন। আমি যদি রাজী হতাম অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াত জানি না। কমরেড দশরথ দেব তখন আমার মতামতকে খুবই মর্যাদা দিতেন।

আমাকে তৎকালীন পার্টির নির্দেশে সাময়িকভাবে গণমুক্তি পরিষদের সাধারন সম্পাদকের পদ থেকে পদত্যাগ করে আসতে হয়েছিল। অবশ্য পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়নি। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বৈপ্লবিক কর্মসূচী রূপায়নের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে ভারতব্যপী একই দিনে সারা ভারত ডাক ও তার বিভাগের কর্মচারী, রেলওয়ে শ্রমিক, কল কারখানা শ্রমিক, যুক্তভাবে ধর্মঘট আহবান করেছিল। ঐ সুনির্দিষ্ট দিনেই কমিউনিস্ট পার্টির অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে পার্টি ইউনিটগুলির প্রতি কড়া নির্দেশ ছিল—তহশীল, কাছাড়ী, থানা ও অন্যান্য সরকারী অফিস দখল করে মুক্ত এলাকা ঘোষনা করা ইত্যাদি। শহরের ছাত্র, যুব, নারী সংগঠন ও জেলে আটক বন্দীদের ও ঐ দিনে সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রাম দিয়ে কড়া নির্দেশ দেওয়া ছিল। মোটের উপর প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে অচল করে দেওয়ার জন্য যা প্রয়োজন সবই করার জন্য পার্টি

কর্মীদের পরিস্কার নির্দেশ ছিল। ত্রিপুরা পার্টি ইউনিটের সম্পাদক হিসাবে আমার উপরও কড়া নির্দেশ ছিল যদি মুক্তি পরিষদকে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করিয়ে পার্টির বৈপ্লবিক কর্মসূচী গ্রহন করাতে না পারি তাহলে মুক্তি পরিষদ থেকে পদত্যাগ করে একাই প্রকাশ্যে লাল ঝাণ্ডা তুলে চূড়ান্ত বিপ্লবের জন্য এগিয়ে যেতে হবে। নতুবা পার্টি থেকে বহিস্কার। এই কড়া সারকুলার পেয়ে আমি রীতিমত বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। কথা নেই, বার্তা নেই, মুক্তি পরিষদ থেকে হঠাৎ পদত্যাগ করে চলে আসা, ইহা হটকারী পদক্ষেপ ছাড়া কিছুই ছিল না। কিন্তু পার্টির তৎকালীন নির্দেশ অমান্য করার উপায়ও ছিল না। তৎসময়ে সামান্যতম দুর্বলতা কিংবা দোদুল্যমানতার কারণে বহু পার্টি সদস্যকে সাময়িক বহিস্কার, বিভিন্ন ধরনের শাস্তি ও পার্টি থেকে বহিস্কার করা হয়েছিল। অনেক পার্টি সদস্যকে দুর্বলতার কারনে দালাল সন্দেহ করে হালালও করা হয়েছিল।

আমি পার্টি কর্মীদের জরুরী মিটিং আহ্বান করে পার্টি কেন্দ্রের কড়া নির্দেশের তাৎপর্য ও জনতার মধ্যে সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পর্যালোচনা করেছিলাম। উক্ত জরুরী মিটিং-এ এলাকার বিশিষ্ট কর্মীরা ছাড়াও কমরেড আতিকুল ইসলাম, কমরেড বঙ্কিম চক্রবর্তী, প্রয়াত গৌরাঙ্গ দেববর্মা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু পার্টির ঊর্ধতন কমিটির নির্দেশ অমান্য করা বা সমালোচনা করার দুঃসাহস কাহারও ছিল না। পার্টি কেন্দ্রের নির্দেশ কার্যকরী করতে হবে ইহাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে আমি মুক্তি পরিষদের সাধারন সম্পাদক হিসেবে জরুরী কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং আহ্বান করেছিলাম। সদর উত্তর গামছাকবড়া পাড়াতে জগবন্ধু দেববর্মার বাড়ীতে মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আমি উক্ত মিটিং-এ পার্টির সিদ্ধান্তমতো সমস্ত বিষয় খোলাখুলি বক্তব্য উপস্থিত করেছিলাম। ঐ দিনই আমি প্রকাশ্যে সর্বপ্রথম ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ত্রিপুরা রাজ্য ইউনিটের সম্পাদক বলে নিজেকে ঘোষনা করেছিলাম। উপস্থিত মুক্তি পরিষদের নেতৃবৃন্দের কমিউনিস্ট পার্টি সদস্যপদ গ্রহন করে বৈপ্লবিক কর্মসূচী রূপায়নের জন্য আত্মনিয়োগ করতে আহ্বান জানিয়েছিলাম। যদি অক্ষমতা জানান হয় তাহলে আমাকে গণমুক্তি পরিষদ থেকে পদত্যাগ করা ছাড়া কোন উপায় নেই বলেও জানলাম।

আমার অপ্রত্যাশিত বক্তব্য শুনে উপস্থিত সকলেই প্রায় হতভম্ব। কমরেড দশরথ দেব আমাকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন "আমরা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ না করলেও বাস্তবক্ষেত্রে পার্টির বৈপ্লবিক কর্মসূচীকেই প্রতিরোধ সংগ্রামের মাধ্যমে কার্যকরী করে চলেছি"। তিনি আরও বলেন যদি সকলেই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহন করতে রাজী থাকেন তাহলে তিনি পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করতে আপত্তি করবেন না। কিন্তু কাহাকেও বাদ দিয়ে পার্টির সদস্যপদ গ্রহন করতে তিনি প্রস্তুত নহেন বলে পরিস্কার

জানিয়ে দেন। কমরেড দশরথ দেব আরও বলেছিলেন—"আমরা ধীরে ধীরে কার্যক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে মুক্তি পরিষদের সমস্ত কর্মীদের বুঝিয়ে প্রসেসের মাধ্যমে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহন করাবো" ইত্যাদি। উক্ত মিটিং-এ কমরেড সুধন্ব্যা দেববর্মা ও প্রয়াত হেমন্ত দেববর্মার কমিউনিস্ট পার্টি সদস্যপদ গ্রহণ করতে আপত্তি ছিল। কমরেড দশরথ দেবের যুক্তিগুলি খুবই গ্রহণযোগ্য ছিল। কিন্তু আমার পক্ষে পার্টির সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ অগ্রাহ্য করার উপায় ছিল না। তাতে উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে অনেকেই দুঃখিত হয়েছিলেন। বিশেষ করে কমরেড বগলা দেববর্মা বার বার আমাকে অনুরোধ করেছিলেন আমি যেন আমার সিদ্ধান্ত পুনরায় বিবেচনা করি। কিন্তু উপায় ছিল না। আমাকে অগত্যা মুক্তি পরিষদ থেকে পদত্যাগ করে চলে আসতে হয়েছিল। কমরেড কুঞ্জ দেববর্মাকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমার সিদ্ধান্তের কথা জেনে সে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। এমন কি আমার সঙ্গে আসতেও আর উৎসাহ ছিল না। অবশ্য ইহার জন্য আমিই দায়ী ছিলাম। কারন তাকে পার্টির সিদ্ধান্তের কথা পূর্বে জানানো হয়নি এবং পার্টির সিদ্ধান্তের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির কথাও তাকে বলা হয়নি। আমার তখন খুবই করুন অবস্থা। গামছাকবড়া পাড়া থেকে সদর দক্ষিণ এলাকায় ফিরে আসাই রীতিমত সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অবশ্য কমরেড কুঞ্জ দেববর্মা শেষ পর্যন্ত বিরক্তি নিয়ে আমার সঙ্গে এসেছিল। কিন্তু আমি ভেঙ্গে পড়িনি। অত্যন্ত সাহসিকতার সহিত এলাকায় এসে পার্টি কর্মীদের সম্মেলন ডেকে পার্টির উর্ধতন কমিটির নির্দেশ মতো প্রকাশ্যে লাল ঝান্ডা তুলে কমিউনিস্ট পার্টির নামে জনসভা করার সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল। সন ও তারিখ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহন করার সময় আগরতলার কয়েকজন কর্মী ছিলেন। এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কোনরকম বিতর্ক ছিল না। সর্বসম্মতিক্রমেই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল।

যথা সময়ে সদর দক্ষিণ এলাকার জন্মেজয় নগর (বর্তমানে বাজার)-এ লাল ঝান্ডা তুলে কমিউনিস্ট পার্টির নামে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। জনসভায় প্রয়াত রাজেন্দ্র দেববর্মা সভাপতিত্ব করেছিলেন। আমি প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রেখেছিলাম। উক্ত জনসভায় বিশ্রামগঞ্জ এলাকা থেকে আমার অধ্যুষিত সমগ্র এলাকার কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। প্রায় পাঁচ শতাধিক জনতা উপস্থিত ছিল। আগরতলার কমরেড আতিকুল ইসলাম সহ কয়েকজন কর্মী উপস্থিত ছিল কিন্তু Exposed হয়ে যাবে বলে কেহ বক্তব্য রাখে নি। কমরেড বঙ্কিম চক্রবর্তী তখন উপস্থিত ছিলেন না।

কমরেড দশরথ দেবের স্মরন থাকা প্রয়োজন মুক্তি পরিষদের বিকল্প সংগঠন হিসাবে কৃষক সমিতি গঠন করার প্রসঙ্গ নিয়ে কোন বিতর্ক ছিল না পাল্টা কৃষক সমিতি গঠনের কোন বিতর্ক নিয়ে আমি মুক্তি পরিষদ থেকে পদত্যাগও করি নাই। মুক্তি পরিষদ সংগঠনগতভাবে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করবে কিনা ইহাই মূল

বিতর্ক ছিল। কাজেই কমরেড দশরথ দেবের এই প্রসঙ্গে বক্তব্য অনেকটা ধান ভাঙ্গতে শিবের গীত গাওয়ার মত এবং রীতিমত বিভ্রান্তিকর। ঐ মিটিং-এ যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে কমরেড বগলা প্রসাদ দেববর্মা সহ অনেকেই জীবিত আছেন।

কমরেড বীরেন দত্ত কমরেড দশরথ দেবের ভুল তথ্যের উপর ভিত্তি করে জনশিক্ষা ও প্রজামণ্ডলের পার্টি সদস্যদের অধিকাংশের মতের বিরুদ্ধে আমি ও কমরেড বঙ্কিম চক্রবর্তী মুক্তি পরিষদের পাল্টা কৃষক সমিতি গঠন করে জন্মেজয় নগরে জনসভা করেছিলাম বলে আমার বিরুদ্ধে একহাত নিয়েছেন। যার বাস্তবতার সহিত কোন সঙ্গতি নেই। পূর্বেই উল্লেখ করেছি মুক্তি পরিষদ গঠিত হওয়ার পর জনশিক্ষা ও প্রজামণ্ডলের কার্যতঃ কোন অস্তিত্ব ছিল না। জনশিক্ষা সমিতি ও মুক্তি পরিষদ নেতৃত্ব বা কর্মীদের মধ্যে তখন পর্যন্ত কেহই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ গ্রহণ করে নাই। রাজ্য প্রজামণ্ডল কর্মীদের মধ্যে কে বা কাহারা বিরোধিতা করেছিলেন তাও কমরেড বীরেন দত্ত উল্লেখ করেন নাই। কাজেই এই প্রসঙ্গে বীরেন দত্তের উল্লেখিত মন্তব্য সম্পূর্ণ অবান্তর।

আমার মুক্তি পরিষদের সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে পদত্যাগের পর সদর উত্তর ও খোয়াই বিভাগের কর্মীদের মধ্যে দারুন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। ইতিমধ্যে সারা ভারতব্যাপী বৈপ্লবিক কর্মসূচী রূপায়নের জন্য পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যে আহ্বান দিয়েছিল তা চূড়ান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। তৎকালীন পার্টির হটকারী নীতির জন্য অনেক মূল্যবান কমরেডদের জীবন দিতে হয়েছিল।

১৯৪৮ সনে কেন্দ্রীয় সরকার বে-আইনী ঘোষনা করার পর অনুরূপভাবে পাকিস্তান স [illegible] ও পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট কর্মীদের উপর পীড়ন আরম্ভ করেছিল। তাতে অনেক পার্টি কর্মীর পূর্ব পাকিস্তান থেকে ত্রিপুরায় আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল। ত্রিপুরা জেলা থেকে কমরেড ইশাবলী মিঞা, সুনীল দাস এবং শ্রীহট্ট জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রয়াত রাখাল রাজকুমার, শিল্পী কমরেড রঞ্জন রায় প্রমুখ ত্রিপুরায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। প্রয়াত রাখাল রাজকুমার প্রথমে আত্মপ্রকাশ না করে খোয়াইরের মুক্তি পরিষদ কর্মীদের সহিত একসঙ্গে থাকতেন। তিনি প্রথমে ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী হিসাবে পরিচয় দিয়েছিলেন। মুক্তি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে খোয়াই বিভাগে সফর করার সময় আমার সহিত সাক্ষাৎ ঘটেছিল। দুইজনে নিভৃতে আলোচনার সময় তিনি আমাকে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। দুইজনে বসে আলোচনা করার সময় আমি প্রয়াত রাখাল রাজকুমারকে খোয়াই বিভাগের পরিষদ কর্মীদের কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করে তোলার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলাম। খোয়াই বিভাগের মুক্তি পরিষদ কর্মীদের কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে আকৃষ্ট হওয়ার পিছনে প্রয়াত রাখাল রাজকুমারের অবদান অনস্বীকার্য। ইতিমধ্যে কমরেড দশরথ দেব আমাকে জরুরী খবর পাঠিয়ে সদর উত্তর এলাকায় ডাকিয়ে এনেছিলেন। দুইজনে গোপনে বসে আমার পদত্যাগ প্রসঙ্গ নিয়ে অনেক

আলোচনা হয়েছিল। পদত্যাগ ব্যাপারটি আমার ব্যক্তিগত ছিল না। ইহা পার্টির ঊর্ধতন কমিটির নির্দেশেই আমাকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল বলে আমি কমরেড দশরথ দেবকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম। তবে ইহা সঙ্গত হয়নি আমি অকপটেই স্বীকার করেছিলাম। এবং আমার পদত্যাগ প্রত্যাহার করেছিলাম। তখন তিনি কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে খুবই আগ্রহশীল ছিলেন। ইতিমধ্যে খোয়াই বিভাগ ও সদর উত্তর এলাকার কর্মীদের সম্মেলনে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের প্রসঙ্গ নিয়ে কয়েকদফা আলোচনা হয়েছিল। উপস্থিত কর্মীদের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের জন্য সকলেই আগ্রহশীল ছিলেন। কিন্তু কমরেড সুধন্ব্যা দেববর্মা অধিকাংশ কর্মী সম্মেলনে অনুপস্থিত থাকতেন। তাই সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্ভব হত না। সর্বশেষ কর্মী সম্মেলনেও তিনি উপস্থিত হতে পারেন নি প্রয়াত হেমন্ত দেববর্মা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একমাস সময় চেয়েছিলেন। আমি পূর্বেই আলোচনা করেছিলাম প্রয়াত হেমন্ত দেববর্মা রাজনৈতিকগতভাবে কমরেড সুধন্ব্যা দেববর্মার অনুগামী। উক্ত সম্মেলনেও প্রয়াত হেমন্ত দেববর্মা বাদে বাকী সবাই কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের জন্য প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। তবে প্রয়াত হেমন্ত দেববর্মাকে একমাস সময় দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা স্থগিত রাখা হয়েছিল। খোয়াই বিভাগের সক্রিয় কর্মীদের মধ্যে প্রয়াত রবীন্দ্র দেববর্মা, কমরেড রামচরন দেববর্মা প্রমুখ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করার জন্য খুবই আগ্রহশীল ছিলেন। মুক্তি পরিষদের সমস্ত নেতৃত্ব ও সক্রিয় কর্মীদের সংগঠনগত নিয়ম শৃঙ্খলা মতে পার্টি সদস্যপদ দেওয়ার ব্যাপারে কমরেড সুধন্ব্যা দেববর্মার অনিচ্ছাকৃত দোদুল্যমানতার জন্য কর্মী সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত কার্যকরী করতে বিলম্বিত হয়েছিল। ইতিমধ্যে আমি গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়াতে পার্টির গঠনতন্ত্র মতে মুক্তি পরিষদ কর্মীদের সদস্যপদ দিতে আরও বিলম্ব ঘটেছিল।

কমরেড বীরেন দত্ত তার লিখিত পুস্তিকাতে ত্রিপুরার ঐতিহাসিক আন্দোলনের ঘটনাগুলিকে যেভাবে অসংলগ্ন ও বিভ্রান্তিকর উক্তিগুলি করেছেন—আমি ঘটনা প্রবাহের বাস্তবতাগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি মাত্র। তৎকালীন পার্টির হটকারী নীতির জন্য যদি কোন রকম ভুল পদক্ষেপ নিয়ে থাকি তার জন্য আমি এবং আমার সহকর্মীরা নিশ্চিতভাবে দায়ী হতে পারি না।

যদি কেহ মনে করে থাকেন তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের যৌথ উদ্যোগ ও অক্লান্ত প্রচেষ্টা ছাড়া রাতারাতি স্বতঃস্ফূর্ততার মধ্যে দিয়ে মুক্তি পরিষদ নেতৃত্ব ও কর্মীরা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেছেন তাহলে অত্যন্ত ভুল করা হবে। ইহার জন্য আমাকে এবং আমার সহকর্মীদের অনেক সময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সংগ্রাম করতে হয়েছিল, কমরেড বীরেন দত্তের মনে রাখা দরকার। এই প্রসঙ্গে মুক্তি পরিষদ নেতৃত্বের একাংশের সহিত আমার মাঝে মধ্যে বিরোধ, মন কষাকষি ও তিক্ততা ইত্যাদি সৃষ্টি হয়েছিল। ইহা ব্যক্তিগত কারণে ঘটে

নাই। তৎসময়ে গণমুক্তি পরিষদের প্রতিরোধ সংগ্রামের প্রাথমিক স্তরে আমার মত একনিষ্ঠ ও সচেতন পার্টি কর্মী যদি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নেতৃত্বের পুরোভাগে না থাকতাম এবং আগরতলা শহরের দায়িত্বশীল পার্টি-কর্মীরা যথা—কমরেড আতিকুল ইসলাম, কমরেড ভানু ঘোষ, কমরেড বেনু সেনগুপ্ত, কমরেড বঙ্কিম চক্রবর্তী, প্রয়াত গৌরাঙ্গ দেববর্মা প্রমুখ রাজনৈতিক যৌথ নেতৃত্ব ও সক্রিয় সহযোগিতা না করতেন তাহলে মুক্তি পরিষদের মত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মোড় কোনদিকে প্রবাহিত হত নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন ছিল। অতি দুর্ভাগ্যের সহিত বলতে হচ্ছে কমরেড বীরেন দত্ত, ত্রিপুরার ঐতিহাসিক আন্দোলনের পটভূমিকাগুলি মূল্যায়নের মানসিকতা পর্যন্ত নেই। তিনি মন্ত্রীত্বের গদি রক্ষার জন্য কোটেশনের পর কোটেশন তুলে কমরেড দশরথ দেবের স্তুতি কীর্তন করেছেন।

পরিশেষে আমার রাজনৈতিক গুরু কমরেড বীরেন দত্তকে অতীত আন্দোলনের ঘটনা প্রবাহের বাস্তবতা ধৈর্য ও সহনশীলতার সহিত মূল্যায়ন করার জন্য অনুরোধ রাখব। আমার পরিবেশিত বক্তব্যগুলি যদি কাহারও আঘাতের কারণ হয়ে থাকে ইহার জন্য আমি খুবই দুঃখিত। কারণ কাহাকেও আঘাত দেওয়া কিংবা হেয় করা আমার উদ্দেশ্য নহে। ঘটনা প্রবাহের বাস্তবতাগুলিকে তুলে ধরাই আমার বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য এই কথা বলেই প্রথম পর্যায়ের বক্তব্যের সমাপ্তি রেখা টানছি।

সংশোধনী

১। ৮ পৃষ্ঠায় ২৭ লাইনে ২২/২/৮২ এর পরিবর্তে ২২-২-৪২ হবে।

২ ১০ পৃষ্ঠার ২৬ লাইনে রবি দত্তের স্থানে "রবি দত্তের ছেলে শক্তি দত্তের" হবে।

৩ ১১ পৃষ্ঠার ৯ লাইনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠার আগে "স্কুল" যোগ হবে।

৪ ৪৩ পৃষ্ঠার ৬ লাইনে ১৯৫৮ ও ১৬ এর পরিবর্তে ১৯৪৮ ও ১৫ হবে।

৫ ৫৩ পৃষ্ঠার ১৭ লাইনে ১৬ এর পরিবর্তে ১৫ হবে।

৬ ৫৪ পৃষ্ঠার ৩০ লাইনে ১৯৪৫ এর স্থানে ১৯৮৫ হবে

৭ ৫৫ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় ও চতুর্থ লাইনে সুধী এর পরিবর্তে সুধী হবে

৮। ৬৯ পৃষ্ঠার ২৫ লাইনে দেবপ্রসাদ সেনগুপ্তের পরেই কমঃ বীরেন দত্ত, কমঃ আতিকুল ইসলাম যোগ হবে।

৯ ৭১ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় লাইনে বিলোনীয়ার স্থানে কমলপুর হবে।

১০। ৭২ পৃষ্ঠার ৩১ লাইনে শিশুকালের স্থানে শিশুকোল হবে

১৪। উৎসর্গ—চাম্পাহাওরার স্থানে "পদ্মবিল"